তা'লিমুত তাওহীদ

হাবীবুল্লাহ মাহমুদ

তা'লিমুত তাওহীদ

হাবীবুল্লাহ মাহমুদ বিন আব্দুল ক্বদীর

তা'লিমুত তাওহীদ

লেখকঃ হাবীবুল্লাহ মাহমুদ বিন আব্দুল ক্বদীর

সম্পাদকঃ জিহাদুল ইসলাম
সহ-সম্পাদকঃ রাফিউল ইসলাম

প্রথম প্রকাশঃ ১৫ই জুমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৫ হিজরী
২৯শে নভেম্বর, ২০২৩ ঈসায়ী

দ্বিতীয় প্রকাশঃ ১লা নভেম্বর, ২০২৪ ঈসায়ী

প্রকাশনায়ঃ অন্তিম প্রকাশনী

হাদিয়াঃ ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র।

অন্যান্য বইগুলোঃ http://cutt.ly/akhirujjamanbooks
যোগাযোগঃ backup.2024@hotmail.com
বই কিনুনঃ http://cutt.ly/ontim_prokashoni

TA'LIMUT TAWHEED BY HABIBULLAH MAHMUD BIN ABDUL QADIR, EDITED BY JIHADUL ISLAM. PUBLISHED BY ONTIM PROKASHONI. COPYRIGHT: PUBLISHER. 1st PUBLISHED ON: 29th NOVEMBER 2023 ISAYI, 15 JUMADA I 1445 AH HIJRI.

সূচিপত্র

ক্র:নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা
০১.	লেখক পরিচিতি	০৪
০২.	ভূমিকা	০৫
০৩.	তা’লিম	০৬
০৪.	আত তাওহীদ	০৮
০৫.	তাওহীদ গ্রহণ করার ফাযিলাত	১২
০৬.	তাওহীদ গ্রহণের দুনিয়াবী উপকার	১৩
০৭.	যদি কোন কাফির অথবা নাস্তিক অথবা মুশরিক হত্যা হওয়ার ভয়ে তাওহীদ ও রিসালাত গ্রহণ করে	১৪
০৮.	প্রশ্ন ও উত্তর - ১	১৫
০৯.	মাসআলা নং ০১ (নাস্তিকদের হত্যা করার বিষয়)	১৫
১০.	ব্যতিক্রমী মাসআলা	১৮
১১.	মাসআলা নং ০২ (পীরদের ক্ষেত্রে)	১৯
১২.	প্রশ্ন ও উত্তর - ২	২৩
১৩.	পরাক্রমশালী মহান আল্লাহ তায়ালার পরিচয়	২৫
১৪.	আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে আক্বিদাহ	৩০
১৫.	তাওহীদের প্রকার	৩৬
১৬.	তাওহীদ আল-আসমা ওয়াছ ছিফাত	৩৬
১৭.	(ক) আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন	৪১
১৮.	(খ) মহান আল্লাহ্ তা’য়ালার নাম সমূহ স্বরণে রাখা	৪২
১৯.	(গ) আল্লাহ তায়ালার নাম সমূহের হিফাজাত করা	৪৪
২০.	(ঘ) আল্লাহ্ তা’য়ালার নামের চাহিদা মোতাবেক আমাল করা	৫৯
২১.	তাওহীদ আর-রুবুবিয়্যাহ	৬১
২২.	তাওহীদ আল-ইবাদাহ (উলূহিয়্যাহ)	৭০
২৩.	ত্বগুতের বিভিন্ন প্রকার	৭৭

লেখক পরিচিতি

নাম মাহমুদ। ডাকনাম জুয়েল মাহমুদ, তাঁর স্বজনদের অনেকে তাকে সোহেল নামেও ডাকে এবং বাংলাদেশসহ ভারতবর্ষের অনেক অঞ্চলের মানুষই তাকে "হাবীবুল্লাহ মাহমুদ" নামে চিনে। পিতা আব্দুল ক্বদীর বিন আবুল হোসেন এবং জননী সাহারা বিনতে রিয়াজ উদ্দিন।

জন্ম: তিনি ১৪১৬ হিজরীর জুমাদিউল আওয়াল মাসের ৬ তারিখ (ঈসায়ী ১৯৯৫ সালের ১লা অক্টোবর) রবিবার সকালে নাটোরের বাগাতিপাড়া উপজেলার পাঁকা ইউনিয়নের অন্তর্গত উত্তর গাঁওপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

পিতা-মাতার দিক থেকে কয়েক জন উর্ধ্বতন পুরুষের নাম:

■ পিতার দিক হতে- আব্দুল ক্বদীর বিন আবুল হোসেন বিন আব্দুল গফুর বিন খাবীর বিন আব্দুল বাকী বিন মাওলানা নজির উদ্দিন আল-যোবায়েরী (রহঃ) বিন মোল্লা আব্দুছ ছাত্তার মুর্শিদাবাদী বিন শাইখ আবদে হাকিম ইউসুফী (রহিঃ)। যিনি ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের কিছু সংখ্যক মুসলিম যোদ্ধাদের নিয়ে 'বদরী কাফেলা' নামে একটি সংগঠন তৈরী করেন এবং তাঁর মাধ্যমে ইংরেজদের সাথে লড়াই করেন। অতঃপর ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে মার্চের ৩ তারিখে তিনি ইংরেজদের হাতে বন্দী হন এবং কলিকাতায় ইংরেজদের কারাগারে বন্দী থাকেন। পরিশেষে তিনি ইংরেজদের নির্যাতনের শিকার হয়ে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ২৮শে জুলাই বাদ আসর কারাগারে ইন্তেকাল করেন।[১]

■ মাতার দিক হতে- সাহারা বিনতে রিয়াজ উদ্দিন বিন ইব্রাহীম বিন কাসেম মোল্লা ওরফে কালু মোল্লা বিন বাহলুল বিন নূর উদ্দিন হেরা পাঠান, যিনি পাকিস্তানের বেলুচিস্তানের অধিবাসী ছিলেন।

শিক্ষা জীবন: তিনি স্থানীয় সালিমপুর মালিগাছা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়া-লেখা করেন। অতঃপর তাঁর নানার সহযোগিতায় স্থানীয় গাঁওপাড়া হাফেজিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং সেখান থেকে কুরআনের নাজরানা শেষ করে তিনি কিছু অংশ মুখস্থও করেন। অতঃপর বাঘা মাদরাসায় ভর্তি হয়ে সেখান থেকে তিনি ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন।

---

১. ভারতবর্ষের মুসলিমদের ইতিহাস (মুসলিম শাসন), লেখক: আব্দুল করিম মোতেম, পৃষ্ঠা ৩০৬।

ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন, ওয়াল আ-ক্বিবাতু লিল মুত্তাক্বীন, ওয়াছ ছলাতু ওয়াস সালামু 'আলা রসূলিহী, ওয়া 'আলা আলীহি ওয়া আছহা-বিহী আজমাঈন। আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বনির রজ্বীম, বিসমিল্লাহির রহমা-নির রহীম।

فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

''ফা'লাম আন্নাহু লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু''। (সূরা মুহাম্মাদ, আ: ১৯)

আম্মাবাদ, সম্মানিত পাঠক, একজন মানুষের চিরস্থায়ী অপবিত্র জীবন থেকে চিরস্থায়ীভাবে পবিত্র হওয়ার একটি মাত্র পন্থা - আর তা হলো ''তাওহীদ''। আর তাওহীদের প্রধান বাণীই হলো ''লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু'' অর্থ- আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ্ নেই। যেহেতু, আল্লাহ তা'য়ালা তাওহীদের বাণীর স্বীকারোক্তি দেওয়ার পূর্বে "ফা'লাম" অর্থ:- অতএব জেনে রাখো, জেনে নাও, শিখে রাখো বা শিখে নাও- শব্দ উল্লেখ্য করে তাওহীদ গ্রহণের পূর্বে তাওহীদ সম্পর্কে জেনে নিতে বা শিক্ষা নিতে আদেশ করেছেন। অতএব, আমরা চিরস্থায়ী পবিত্রতা অর্জনের জন্য তাওহীদ সম্পর্কে শিক্ষা অর্জন করে তাওহীদকে গ্রহণ করবো। আর তাওহীদের প্রকৃত শিক্ষা মুসলিম উম্মাহর মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টাতেই আমি অত্র কিতাবটি রচনা করলাম। যার নামকরণ করলাম ''তা'লীমুত তাওহীদ''। আমি আশা রাখি অত্র কিতাবটি পাঠের মাধ্যমে অনেক মানুষই আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করা থেকে বিরত থেকে নিজেকে চিরস্থায়ী অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করবে এবং মুসলিমগণ আল্লাহ তায়ালার তাওহীদের প্রকৃত শিক্ষা লাভ করবে, ইংশাআল্লাহ্। মহান আল্লাহ তা'আলা অত্র কিতাবটি পড়ে বুঝে সকলকে আমল করার তাওফিক দান করুন (আমীন)। অতঃপর কিতাবটি কলম দ্বারা কাগজে লেখা থেকে শুরু করে সুন্দরতম একটি কিতাব তৈরি করে পাঠকের হাতে পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত যারা কিতাবটির পিছনে সময় ও শ্রম ব্যয় করেছেন আমি তাদের সকলের জন্যই আন্তরিকতার সহিত দু'আ করি যেন আল্লাহ তা'য়ালা সেই সকল সময়-শ্রমদাতাদের উত্তম বিনিময় দান করেন (আমীন)। অতঃপর, কিতাবটি লিখতে গিয়ে তাতে শব্দে বা বানানে ভুল হওয়াটি অস্বাভাবিক নয়। কাজেই কোন ভুল পাঠকের দৃষ্টিতে আসলে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন এবং পরবর্তী সংশোধনের জন্য অবগত করবেন।

নিবেদক
হাবীবুল্লাহ মাহমুদ
০৩/১১/২০২৩ ইং

তা’লীম

তা’লীম অর্থ শিক্ষা করা। আর আমাদেরকে যেই বিষয়ে শিক্ষা করতে হবে সেই বিষয়টি হলো- তাওহীদ অর্থাৎ আল্লাহ তা’য়ালার একত্ববাদের শিক্ষা করতে হবে। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর প্রতিই ইলম অর্জন করা ফরজ। সেহেতু মুসলিম উম্মাহর সকল নারী পুরুষকেই ইলম অর্জন করতে হবে। প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে আমরা কি বিষয়ে ইলম অর্জন করবো? এবং তা কতটুকু অর্জন করতে হবে? প্রথম বিষয় হলো কি বিষয়ে ইলম অর্জন করবো? যেহেতু, আমরা আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর ঘোষণা থেকেই জানতে পেরেছি, মুসলিম উম্মাহর নারী-পুরুষ সকলের প্রতিই ইলম অর্জন করা ফরজ। সেহেতু আল্লাহর রসূল (ﷺ) এর ইলম শিখানোর পদ্ধতিতে জানবো সর্বপ্রথম আমাদেরকে কোন বিষয়ে ইলম অর্জন করতে হবে। আর ইলম শিখানোর পদ্ধতি উল্লেখিত হাদিসে- হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) এর মুক্ত গোলাম আবু মা’বাদ (রহিঃ) বলেন, আমি আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) কে বলতে শুনেছি, যখন নবী (ﷺ) মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) কে ইয়ামানে পাঠালেন তখন তিনি তাকে বললেন, তুমি আহলে কিতাবদের একটি কওমের নিকট যাচ্ছ। অতএব, তাদের প্রতি তোমার প্রথম আহ্বান হবে, তারা যেন আল্লাহর একত্ববাদ বা তাওহীদকে মেনে নেয়। (ছহীহ বুখারী, হাঃ ৭৩৭২)

অতএব, মুসলিম উম্মাহর সকল নারী-পুরুষকেই যেই বিষয়ে সর্বপ্রথম ইলম অর্জন করতে হবে তা হলো- আল্লাহর একত্ববাদ বা তাওহীদ। তাওহীদ এর ইলম অর্জন করা ফরজ করে দিয়ে আল্লাহ বলেন- ‘‘ফা’লাম আন্নাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’’। অর্থ- সুতরাং যেনে রাখো বা জ্ঞান রাখো যে আল্লাহ ছাড়া (সত্য) কোন ইলাহ্ নেই। (সূরা মুহাম্মাদ, আঃ ১৯)। যেহেতু, মহান আল্লাহ্ তা’য়ালা তার তাওহীদ সম্পর্কে শিখতে বা জানতে আদেশ করেছেন। সেহেতু আমাদেরকে শিখতে বা জানতে হবে, আর জানতে হলে পড়তে হবে। আর সে জন্যই মহান আল্লাহ্ তা‘য়ালা তার বান্দাদের প্রতি সর্বপ্রথম রব সম্পর্কে পড়তে আদেশ দেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ . خَلَقَ ٱلْإِنسَـٰنَ مِنْ عَلَقٍ . ٱقْرَأْ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ . ٱلَّذِى عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ . عَلَّمَ ٱلْإِنسَـٰنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ .

‘‘পড় তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন মানুষকে ‘আলাক’ হতে। পড়, আর তোমার রব মহামহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানতো না’’। (সূরা আলাক্ব, আঃ ১-৫)।

অতএব, মুসলিমদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদরাসা সমূহতে তা হোক আলিয়া অথবা ক্বওমিয়া কিংবা গ্রাম অঞ্চলের মসজিদের মক্তবখানা অথবা ফুরকানিয়া মাদরাসা। সবখানেই মুসলিমদের কায়দা বা ছেপারা শেষে কুরআনে মাজিদ ৪-৫ পারা পড়ার পরেই সর্বপ্রথম যেই শিক্ষাটি প্রদানের জোর তাগিদ তথা ওয়াজিব ছিলো তা হলো "আল্লাহ তা'য়ালার একত্ববাদ বা তাওহীদ তথা তাওহীদ শিক্ষা।

কিন্তু মুসলিম উম্মাহর জন্য বড় আফসোসের বিষয় যে, মুসলিমদের শতকরা ৯৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই তাওহীদ শিক্ষা প্রদান করা হয় না। ফলে মুসলিম উম্মাহের সাধারণ শ্রেণীর মানুষ তো দূরের কথা, অধিকাংশ মাসজিদের ইমাম ও অধিকাংশ মাদরাসার শিক্ষকগণও আল্লাহর তাওহীদ সম্পকে বিশুদ্ধ ধারণা তো দূরের কথা, ধারণাই রাখে না। যার দরুন, সেই সকল ইমাম ও শিক্ষকগণও প্রতিনিয়তই লিপ্ত হচ্ছে "শিরক্" নামের ভয়াবহ গোনাহে। সেই গোনাহের ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করা ক্ষমা করেন না। তা ব্যতীত অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করেন এবং কেহ আল্লাহর শরীক করলে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়’’। (সূরা নিসা, আঃ ১১৬)

আর মুশরিক তথা আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপনকারীদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ

কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরী করে তারা এবং মুশরিকরা জাহান্নামের অগ্নিতে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে, তারাই সৃষ্টির নিকৃষ্ট। (সূরা বায়্যিনাহ, আঃ ০৬)

অতএব, সৃষ্টির মধ্যে নিকৃষ্ট জীব 'মুশরিক' হওয়া থেকে নিজেকে পবিত্র রাখতে শিরক তথা আল্লাহর সাথে শরীক স্থির করা থেকে নিজেকে দূরে রাখতে হবে। আর শিরক থেকে নিজেকে দূরে রাখতে, অবশ্যই অবশ্যই একজন মুসলিমকে বিশুদ্ধ তাওহীদ সম্পর্কে জ্ঞান রাখতে হবে তথা শিখতে হবে।

আত তাওহীদ

তাওহীদ অর্থ একত্ববাদ। পারিভাষিক অর্থে মহান আল্লাহ তা'য়ালার একত্ববাদকে তাওহীদ বলে। ইমাম বুখারী (রহঃ) তার ছহিহুল বুখারীতে কিতাবুত তাওহীদ পর্বে ‘‘মা জা-আ ফী দুআ'ইন্নাবিইঈ (ﷺ) উম্মাতাহু ইলা তাওহীদিল্লাহি তাবা-রকা তা'য়ালা'' নামে একটি অধ্যায় রচনা করেন। সেখানে তিনি ইবনু আব্বাসের মুক্ত গোলাম আবু মা'বাদ (রহিঃ) এর একটি হাদিস উল্লেখ্য করেন যা তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে শুনেছেন, সেই হাদিসটিতে আল্লাহর রসূল (ﷺ) ‘‘ওয়াহ্হিদুল্লোহা তা'য়ালা'' অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'য়ালার একত্ববাদ তথা তাওহীদকে উল্লেখ করেছেন। অতএব, তাওহীদ সর্বাবস্থাতেই মহান আল্লাহ্ তায়ালার একত্ববাদের ঘোষণা করে। আর তাওহীদের প্রধান বাণী হলো: ‘‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্''। অর্থঃ আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ্ নেই। কাজেই এই বাণীটিকে আবার ‘‘কালিমাতুত তাওহীদ'' বলা হয়। (ইসলামের বুনিয়াদ শিক্ষা, পৃঃ ১২)

আর এই কালিমাতুত তাওহীদকে দুইটি অংশে ভাগ করা যায়। যথা- ১। বর্জনীয় ২। গ্রহণীয়।

১ বর্জনীয় তথা ‘‘লা ইলাহা'' অর্থাৎ 'সত্য কোন ইলাহ নেই'। অর্থাৎ যাবতীয় মিথ্যা/বাতিল ইলাহকে বর্জন করতে হবে। আর ঐ সকল মিথ্যা/বাতিল ইলাহদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَ يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ شَيْئًا وَّ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ

আর তারা কি ইবাদত করবে আল্লাহ ব্যতীত অপরের যাদের আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী হতে কোন জীবনোপকরণ সরবরাহ করার ক্ষমতা নাই, এবং তারা কিছুই করতে সক্ষম না। (সূরা নাহল, আঃ ৭৩)

অন্য এক আয়াতে মহান আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের উপমা দিয়ে বুঝাচ্ছেন,

ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوْكًا لَّا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّ مَنْ رَّزَقْنٰهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَّ جَهْرًا هَلْ يَسْتَوٗنَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ

আল্লাহ উপমা দিচ্ছেন অপরের অধিকারভূক্ত এক দাসের। যে কোন কিছুরই উপর শক্তি রাখে না। এবং এমন এক ব্যক্তির যাকে তিনি নিজ হতে উত্তম রিযিক দান করেছেন। এবং সে তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে; তারা কি একে অপরের সমান? সকল প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য; অথচ তাদের অধিকাংশই তা জানে না। (সূরা নাহল, আঃ ৭৫)

অত্র আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বিবেক সম্পন্ন মানুষদের নিকট উদাহরণ স্বরূপ একটি প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন। তা হলো, একজন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ তা'য়ালা নিজ হতে উত্তম রিযিক দান করেছেন, আর সেই ব্যক্তিটি সেই রিযিক হতে গোপনে অথবা প্রকাশ্যে সর্বাবস্থাতেই ব্যয় করতে পারে। আর সেই ব্যক্তিরই একটি সাধারণ দাস আছে, যার কোন কিছুর উপরই শক্তি বা ক্ষমতা নাই, তার নিজস্ব কোন ক্ষমতা নাই। এই দুই ব্যক্তি কি সমান? বিবেকবান মানুষ অবশ্যই উত্তর দিবে- না, কক্ষনোই সমান নয় (সুবহানআল্লাহ্)। অনেক হিকমাহ্পূর্ণ একটি উদাহরণ স্বরূপ প্রশ্ন। তবে যদি নিঃস্ব/ক্ষমতাহীন একজন দাস কোন কিছুর উপর কোন ক্ষমতা না রাখে, তার মনিব ঐ ব্যক্তির উপর। তবে এটা কেমন নির্বোধের কথা যে, আসমান জমিনের সকল কিছুর উপর সর্বশক্তিমান আল্লাহর সাথে নিঃস্ব/ক্ষমতাহীন সৃষ্টি অংশীদার স্থাপন করে। অথচ মহান আল্লাহ্ তাঁর কর্তৃত্ব প্রকাশ করে বলেন,

إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَىٰ ۖ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ. فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ .

وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِتَهْتَدُوا۟ بِهَا فِى ظُلُمَـٰتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْـَٔايَـٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
. وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْـَٔايَـٰتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ . وَهُوَ
ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِۦ نَبَاتَ كُلِّ شَىْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا
مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّـٰتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ
مُتَشَـٰبِهٍ ۗ ٱنظُرُوٓا۟ إِلَىٰ ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثْمَرَ وَيَنْعِهِۦٓ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكُمْ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ .

আল্লাহই শস্য-বীজ ও আঁটি অংকুরিত করেন। তিনিই প্রাণহীন হতে জীবন্তকে বাহির করেন এবং জীবন্ত হতে প্রাণহীনকে বাহির করেন। তিনিই তো আল্লাহ্, সুতরাং তোমরা কোথায় ফিরিয়া যাবে? তিনিই ঊষার উন্মেষ ঘটান, তিনিই বিশ্রামের জন্য রাত্রি এবং গননার জন্য সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন। এই সবই পরাক্রমশালী মহাজ্ঞানীর নিরুপন। তিনিই তোমাদের জন্য নক্ষত্র সৃষ্টি করেছেন যেন তা দ্বারা স্থলের ও সমুদ্রের অন্ধকারে তোমরা পথ পাও। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আমি তো নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করেছি। তিনিই তোমাদেরকে একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য দীর্ঘ ও স্বল্পকালীন বাসস্থান রয়েছে। অনুধাবনকারী সম্প্রদায়ের জন্য আমি তো নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করেছি। তিনিই আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন। অতঃপর তা দ্বারা আমি সর্বপ্রকার উদ্ভিদের চারা উদগম করি। অনন্তর- তা হতে সবুজ পাতা উদগত করি, পরে তা হতে ঘন সন্নিবিষ্ট শস্য-দানা উৎপাদন করি এবং খেজুর বৃক্ষের মাথি থেকে ঝুলন্ত কাঁদি নির্গত করি। আর আঙ্গুরের উদ্যানরাজি সৃষ্টি করি এবং যয়তুন ও ডালিমও। এরা একে অন্যের সাদৃশ্য এবং বিসদৃশ্যও। লক্ষ্য করো তার ফলের প্রতি যখন তা ফলবান হয় এবং তার পরিপক্কতা প্রাপ্তির প্রতি। মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য তাতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। (সূরা আনআম, আঃ ৯৫-৯৯)

অতএব, যেই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'য়ালা বান্দা-বান্দীদের জন্য এত নিয়ামত দান করেছেন সেই সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'য়ালার সমপরিমাণ অথবা আংশিক অথবা তা থেকেও অনেক কম বা এক জাররাহ্ পরিমাণও অংশীদার কেউ হতে পারেনা। সুতরাং, আল্লাহ্ ব্যতীত যত ইলাহ্ আছে সমস্ত ইলাহই মিথ্যা/বাতিল। কাজেই তাদের সকলকেই বর্জন করতে হবে। অতঃপর,

২ গ্রহণীয় তথা ইল্লাল্লাহ্। যেহেতু প্রথমে বর্জনীয় বিষয় এসেছে সেহেতু পরের অংশে ব্যতিক্রম বিষয় এসেছে। আর সেই ব্যতিক্রমটাই হলো গ্রহণীয় বিষয়। কারণ পূর্ণ বাক্য হলো- সত্য কোন ইলাহ্ নাই (ব্যতিক্রম হলো) আল্লাহ্ ছাড়া। যার মূল তাওহীদ হবে আল্লাহ্ ব্যতীত সত্য কোন ইলাহ্ নাই। যা আছে সব ইলাহই মিথ্যা, বানোয়াট, বাতিল। একমাত্র মহান আল্লাহ্ তা'য়ালাই সত্য; কাজেই সমস্ত মিথ্যা ইলাহকে বর্জন করে একমাত্র সত্য ইলাহ্ মহান আল্লাহ্ তা'য়ালাকে আঁকড়ে ধরতে হবে। এ প্রসঙ্গে পরাক্রমশালী মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, "তোমাদের ইলাহ্ এক ইলাহ্। সুতরাং যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর সত্যবিমুখ এবং তারা অহংকারী" (সূরা নাহল, আঃ ২২)। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা আরো বলেন, "আল্লাহ্ বলিলেন, তোমরা দুই ইলাহ্ গ্রহণ করিও না; তিনিইতো একমাত্র ইলাহ্। সুতরাং, আমাকেই ভয় করো" (সূরা নাহল, আঃ ৫১)। অত্র আয়াতেও মহান আল্লাহ তা'য়ালা স্পষ্টভাবে ঘোষণা দিয়ে দিয়েছেন যে, সত্য ইলাহ্ একমাত্র একজন; ভুলেও তোমরা দ্বিতীয় বা আরো অধিক ইলাহ্ যেইগুলো বাতিল/মিথ্যা ইলাহ্, তাদেরকে গ্রহণ করো না। যদি ভুলেও গ্রহণ করে থাকো তবে তোমরা মুশরিক হয়ে যাবে। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় করে হলেও আল্লাহর সাথে অন্য কারো বা অন্য কিছুর অংশীদার সাব্যস্থ করো না। আর তোমরা মুশরিক হওয়া থেকে আল্লাহকে ভয় করো। আর তা ব্যতীতও একই রাজত্বে যদি দুইটি ইলাহ্ বা দুই এর অধিক ইলাহ্ থাকে তাহলে বান্দা-বান্দীগণ তো বিভ্রান্তিতে পড়ে যাবে যে, তারা কোন ইলাহ্-এর গোলামী করবে; কোন ইলাহের আদেশ মানবে!

অতএব, এত ইলাহ্ তৈরি করে তাদের গোলামী করার তো কোন যুক্তিকতাই নেই। যেখানে আমরা পরাক্রমশালী একজন ইলাহ্ হিসেবে মহান আল্লাহকে পেয়েছি, যিনি সকল কিছুর স্রষ্টা এবং তিনিই সকল কিছুর প্রতিপালক। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি জগৎ সমূহের প্রতিপালক। নির্বোধ লোকদেরকে তো সেই শিক্ষাই দিচ্ছিলেন হযরত ইউসুফ (আঃ) যা মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, (আল্লাহর নাবী ইউসুফ (আঃ) বলেছেন) "হে কারা সঙ্গীদ্বয়! ভিন্ন ভিন্ন বহু প্রতিপালক শ্রেয়, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ?" (সূরা ইউসুফ, আঃ ৩৯)। সুতরাং আমরা তো এমন এক পরাক্রমশালী আল্লাহকে আমাদের ইলাহ্ হিসেবে

গ্রহণ করেছি যাকে পরাস্ত করার ক্ষমতা যাবতীয় বাতিল ইলাহ্‌ের নেই। বরং তারাই পরাক্রমশালী ইলাহ্ মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার সৃষ্টি; অথবা মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার সৃষ্টি জীব দ্বারা সৃষ্টি। তারা কীরূপে পরাক্রমশালী আল্লাহর সাথে অংশীদার হয়? অথবা তাদেরকে কীরূপে নির্বোধ মানুষ অংশীদার হিসেবে দাড় করায়?

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, ‘‘আর তারা আল্লাহর পরিবর্তে তাঁকে বাদ দিয়ে এমন কিছুকে ইলাহ্ বানিয়ে নিয়েছে যারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারেনা। তেমনি নিজেরা নিজেদের কোনো উপকারও করতে সক্ষম নয়, তারা কাউকে মৃত্যু দিতে পারে না, কাউকে জীবনও দিতে পারে না, পারেনা কাউকে পুনরায় (কবর থেকে) উঠিয়ে আনতে। (সূরা ফুরকান, আঃ ৩)

অতএব, ঐ সকল মিথ্যা-ভিত্তিহীন, বাতিল ইলাহদেরকে অবশ্যই অবশ্যই বর্জন করে একমাত্র ইলাহ্ মহান আল্লাহ্ তা'য়ালাকেই গ্রহণ করতে হবে। সুতরাং 'লা ইলাহা' অর্থাৎ ‘সত্য কোনো ইলাহ্ নাই’ তথা যাবতীয় মিথ্যা ইলাহকে বর্জন করতে হবে। ‘ইল্লাল্লাহ’ অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া কারণ একমাত্র সত্য ইলাহ্ মহান আল্লাহ্ তা'য়ালাই। কাজেই তাকে আমাদের একমাত্র সত্য ইলাহ্ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে বা আঁকড়ে ধরতে হবে।

৯ তাওহীদ গ্রহণ করার ফাযিলাত

তাওহীদ গ্রহণ করার ফাযিলাত হলো- তাওহীদ গ্রহণকারী ব্যক্তি যদি আন্তরিকতার সহিত আল্লাহর তাওহীদকে গ্রহণ করে তবে আল্লাহ্ তাকে মাফ করে দেন। যদিও সে শিরকের মত বড় পাপ করে। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর নাবী (ﷺ) বলেছেন, আরশের সম্মুখে একটি নূরের খুঁটি আছে, যখন কোন ব্যক্তি ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ তথা তাওহীদ আন্তরিকতার সহিত বলে, তখন ঐ খুঁটি হেলতে আরম্ভ করে। আল্লাহ্ বলেন, স্থির হও! উত্তরে খুঁটি বলে- ‘আমি কেমন করে স্থির হবো, অথচ এখন পর্যন্ত তাওহীদ পাঠকারীর গুনাহ্ মাফ হয়নি’। তখন আল্লাহ্ বলেন, ‘‘আচ্ছা, আমি তার গুনাহ্ মাফ করে দিলাম’’। তখন সেই খুঁটি স্থির হয়ে যায়। (ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত্ তাহরীব)

একথা স্পষ্ট যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) এর নবুওয়াত প্রাপ্তির মধ্যে দিয়ে মুসলিম উম্মাহের জন্য দুইটি কালিমা নির্ধারিত হয়েছে- (১) কালিমাতুত্ তাওহীদ, (২) কালিমাতুর্ রিসালাহ্ (ইসলামের বুনিয়াদ শিক্ষা, পৃষ্ঠাঃ ১৩)। অতএব, কালিমাতুত তাওহীদ গ্রহণের পাশাপাশি কালিমাতুর্ রিসালাহকে গ্রহণ করতে হবে। যেমন: আল্লাহর রসূল (ﷺ) এর একটি উল্লেখিত ঘোষণা- হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নাবী (ﷺ) বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি "আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য ইলাহ্ নেই এবং আমি আল্লাহর রসূল। যে এ দুটি বিষয়ের প্রতি সন্দেহাতীত বিশ্বাস রেখে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে"। (ছহীহ মুসলিম, হাঃ ৪৭; হাদিসের বিশেষাংশ) যেহেতু আমাদের বর্তমান আলোচনা তাওহীদ সম্পর্কে সেহেতু তাওহীদ প্রসঙ্গেই বলছি।

⅏ তাওহীদ গ্রহণের দুনিয়াবী উপকার

তাওহীদ গ্রহণ করলে যে শুধু পরকালীন জীবনেই লাভ আছে তা নয়; বরং দুনিয়াবী জীবনেও উপকার রয়েছে। যেমন হযরত ইবনু উমার (রা:) বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, "আমি ততক্ষন পর্যন্ত (আল্লাহর পক্ষ হতে) লোকদের বিরুদ্ধে স্বশস্ত্র যুদ্ধ করতে আদেশপ্রাপ্ত, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া (সত্য) কোন ইলাহ্ নেই এবং নিঃস্বন্দেহে মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল, আর তারা ছলাত কায়েম করবে ও যাকাত প্রদান করবে। তারা এগুলো করলে তাদের রক্ত ও সম্পদ আমার কাছ থেকে নিরাপদ করে নিল। তবে ইসলামের হক (অপরাধের শাস্তি) তাদের উপর থাকবে। আর তাদের প্রকৃত ফয়সালা আল্লাহ্ তা'য়ালার উপর সমর্পিত। (রিয়াদুছ ছলিহীন, হাঃ ৩৯০)

অন্য এক হাদীসে হযরত আবু আব্দুল্লাহ্ তারিক ইবনে উশায়েম (রাঃ) বলেন, আমি আল্লাহর রসূল (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি বলে যে, আল্লাহ্ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ্ নেই, নিঃস্বন্দেহে মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর রসূল এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য যে সব বস্তুর পূজা করা হয়, সে সেগুলোকে অস্বীকার করে। তার জান ও মাল নিরাপদ হয়ে গেল। আর তার হিসাব মহান আল্লাহর উপর সমর্পিত। (রিয়াদুছ ছলিহীন, হাঃ ৩৯১)

■ <u>যদি কোন কাফির অথবা নাস্তিক অথবা মুশরিক হত্যা হওয়ার ভয়ে তাওহীদ ও রিসালাত গ্রহণ করে</u>:

যদি কোন কাফির অথবা নাস্তিক অথবা মুশরিককে হত্যা করতে যাওয়া হয় অথবা তারাই যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করার জন্য উপস্থিত হয়। অতঃপর সে অস্ত্রের সম্মূখে পরে হত্যা হওয়ার ভয়ে তাওহীদকে গ্রহণ করে তবে তাদেরকে হত্যা করা বৈধ নয়। এ প্রসঙ্গে হযরত আবু মা'বাদ মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রাঃ) বলেন, আমি আল্লাহর রসূল (ﷺ) কে বললাম, ‘‘আপনি বলুন, যদি আমি কোন কাফেরের সম্মুখীন হই এবং পরস্পরের মধ্যে সশস্ত্র যুদ্ধ করি, অতঃপর সে তরবারি দিয়ে আমার হাত কেটে দেয়। তারপর (পাল্টা) আক্রমন থেকে বাঁচার জন্য সে একটি গাছের আশ্রয় নিয়ে বলে, ‘‘আমি আল্লাহর ওয়াস্তে ইসলাম গ্রহণ করলাম। তার একথা বলার পর, হে আল্লাহর রসূল! আমি কি তাকে হত্যা করবো?’’ তিনি বললেন, ‘‘তাকে হত্যা করো না’’। আমি বললাম, ‘‘হে আল্লাহর রসূল! সে আমার একটি হাত কেটে ফেলবে। কাঁটার পর সে ঐ কথা বলবে তাও?’’ তিনি বললেন, "তুমি তাকে হত্যা করো না। যদি তুমি তাকে হত্যা করো, তাহলে (মনে রাখ) সে তোমার সেই মর্যাদা পেয়ে যাবে, যাতে তুমি তাকে হত্যা করার পূর্বে ছিলে। আর তুমি তার ঐ কথা বলার পূর্বের অবস্থায় উপনীত হবে। (রিয়াদুছ ছলেহীন, হাঃ ৩৯৭; সহীহুল বুখারী ৪০১৯, ৬৮৬৫; মুসলিম ৯৫; আবূ দাউদ ২৬৪৪; আহমাদ ২৩২৯৯, ২৩৩০৫, ২৩৩১৯)

উপরোক্ত হাদিসটিতে একথা প্রতিয়মান হয় যে, মুশরিক কাফের নাস্তিক তারা যদি সরাসরি সশস্ত্র যুদ্ধের মাঠে এসে মুসলিম কোন সৈনিকের উপর আক্রমণ করে সেই ব্যক্তিকে অঙ্গহানী করে দেয়। অতঃপর যদি সে তাওহীদ গ্রহণ করে নেয় তবুও সেই ব্যক্তিকে হত্যা করা যাবে না। বরং তাকে মুমিন হিসেবেই গণ্য করতে হবে। যদি তাওহীদ গ্রহণ করার পরেও তাকে হত্যা করা হয় তবে একজন মুমিনকেই সেচ্ছায় হত্যা করা হবে।

প্রশ্ন ও উত্তর - ১

প্রশ্নঃ আমাদের বাংলাদেশেও দেখা যায় এক শ্রেণীর জিহাদ প্রিয় যুবক যারা নাস্তিকদের এবং পীরদেরকে হত্যা করে সেই ক্ষেত্রে এর বিধান কি হবে?

উত্তরঃ এখানে মাসআলা দুইটি বিষয়ে হবে-

১। নাস্তিকদের হত্যা করার বিষয়

২। পীরদেরকে হত্যা করার বিষয়

៣ মাসআলা নং ০১ (নাস্তিকদের হত্যা করার বিষয়):

হযরত ইকরিমাহ্ (রহিঃ) বলেন, হযরত আলী (রাঃ) এর কাছে একদল যিন্দীককে (তথা নাস্তিক ও ধর্মত্যাগীকে) আনা হলো, তিনি তাদেরকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিলেন। এ ঘটনা ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর কাছে পৌছলে তিনি বললেন, আমি কিন্তু তাদেরকে পুড়িয়ে ফেলতাম না। কেননা, আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর নিষেধাজ্ঞা আছে যে, তোমরা আল্লাহর শাস্তি দ্বারা শাস্তি দিও না, বরং আমি তাদেরকে হত্যা করতাম। কারণ, আল্লাহর রসূল (ﷺ) এর আদেশ আছে যে, কেউ তার দ্বীন বদলে ফেলে (তথা মুসলিম থেকে নাস্তিক-মুরতাদ হয়ে যায়) তাকে তোমরা হত্যা করো। (ছহীহ বুখারী, হাঃ ৬৯২২) অতএব, নাস্তিক-মুরতাদদেরকে হত্যা করতে হবে এটা মুসলিমদের উপর ওয়াজিব। তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই কয়েকটি শর্ত দেখতে হবেঃ

■ (১) মুসলিমদের ভূমি বা ইমারাহ্ আছে কিনা, যেখানে কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা বিধান পরিচালিত হয়। এটার কারণ, যদি মুসলিমদের ভূমি বা ইমারাহ্ না থাকে, তবে নাস্তিকদের হত্যা করা উচিত নয়। কারণ, আগে মুসলিমদের ভূমি বা ইমারাহ্ তৈরি করতে হবে। তারপরে কুরআন-সুন্নাহর বিধান কার্যকর করার ব্যবস্থা করতে হবে। কেননা, এটাই রসূল (ﷺ) এর সুন্নাহ্। তিনি মক্কা হতে মদিনায় গিয়ে ইসলামী ভূমি গঠনের পর কা’ব ইবনে আশরাফকে হত্যা করিয়েছিলেন। কিছু সাহাবীদেরকে (রাঃ) পাঠিয়ে। আর ঐ কা’ব ইবনে আশরাফ আল্লাহর রসূল (ﷺ) এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন কটু মন্তব্য প্রচারণা করতো। (আর রাহীকুল মাখতুম, কা‘ব ইবনু আশরাফের হত্যা পরিচ্ছেদ; ইবনু হিশাম, ২য় খন্ড, ৫১-৫৭ পৃঃ; সহীহুল

বুখারী, ১ম খন্ড, ৩৪১-৪২৫ পৃঃ ও ২য় খন্ড, ৫৭৭ পৃঃ; সুনানে আবূ দাউদ আউনুল মা'বূদ সহ দ্রষ্টব্য, ২য় খন্ড, ৪২-৪৩ পৃঃ এবং যা'দুল মাআ'দ, ২য় খন্ড, ৯১ পৃঃ)

■ (২) হত্যা করতে আল্লাহ্ প্রদত্ত অভিভাবক অথবা ইমারাহ্ প্রধানের আদেশ আছে কিনা? এটার কারণ, যে কোন ব্যক্তির আদেশে হত্যা করা যাবে না। এতে সমাজ বা রাষ্ট্রে ফিতনা বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। যদি আল্লাহ প্রদত্ত অভিভাবকের আদেশে হত্যা হয় সেক্ষেত্রে হত্যাকারীরা গোনাহের মধ্যে পতিত হবে না। এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারবে। যেমন, আল্লাহ প্রদত্ত অভিভাবক খলীফা মাহদী, ইমাম মানসুর অর্থাৎ যাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ প্রদত্ত অভিভাবক হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহর রসূল (ﷺ) এর হাদিস আছে। অথবা ইমারাহ প্রধানের আদেশে হত্যা হয়। সেক্ষেত্রে ইমারাহর প্রশাসন কিতাবুল্লাহ্ ও ন্যায় ইনসাফের বিচার বিভাগ দ্বারা বিশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে আনবে। অতঃপর, সাধারণ কোনো দলের আমীরের আদেশে হত্যা করা হলে ফিতনায় পড়তে হবে, বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পাবে। একথা স্পষ্ট যে, আল্লাহর রসূল (ﷺ) এর আদেশে কা'ব ইবনে আশরাফকে হত্যা করা হয়েছিল। কারণ আল্লাহর রসূল (ﷺ)-ই ছিলেন শরীয়তের ধারক বাহক। আর হযরত আলী (রাঃ) নাস্তিক মুরতাদদের হত্যা করেছিলেন। কারণ, তিনি ছিলেন একজন খলীফা ও আল্লাহ্ প্রদত্ত অভিভাবক।

■ (৩) নাস্তিককে হত্যা করার পর তার পক্ষের শক্তি অথবা তার অনুসারী কিংবা ত্বগুতি বাহিনীর সাথে মোকাবিলা করার মত জনশক্তি-অস্ত্রশক্তি আছে কিনা; কেননা কা'ব ইবনে আশরাফকে হত্যা করতে আল্লাহর রসূল (ﷺ) একদল স্বশস্ত্র যোদ্ধা সাহাবীদেরকে পাঠিয়েছিলেন এবং পাশাপাশি সেই যোদ্ধাদের আনসার হিসেবে আরও একটি স্বশস্ত্র বাহিনী পাঠিয়েছিলেন (আর রাহিকুল মাখতুম, কা'ব ইবনু আশরাফের হত্যা পরিচ্ছেদ)। আর এটাই আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর সুন্নাত। স্বশস্ত্র বাহিনী না গঠন করেই বিধান কার্যকর করতে যাওয়া "ছতর খুলে পাগড়ী মাথায় দেয়ার অনুরূপ"। এই শর্তগুলো ব্যতীত আরো কিছু শর্ত আছে। এখানে শুধু মাত্র কয়েকটি মূল বিষয় উল্লেখ করলাম। অতঃপর যদি কোন মুসলিম বাহিনীর উপরোক্ত সকল শর্তই পূরণ থাকে- যথা: ইসলামী ইমারাহ্, আল্লাহ প্রদত্ত অভিভাবক অথবা ইমারাহ্ প্রধানের আদেশ, স্বশস্ত্র মুজাহিদ বাহিনী, তাদের প্রয়োজনীয় অস্ত্র সরঞ্জাম। তারপরেও আরো কিছু বিষয় দেখার থাকে যে-

- (১) নাস্তিক ব্যক্তিটি শিশু কিনা। কারণ, সে শিশু হলে তাকে শাস্তি প্রদান করা যাবে না। যেমন, একটি ছেলে একটি যুবতি মেয়ের সম্পর্কে বলে, আমি তার সাথে ব্যভিচার করেছি। প্রকৃতপক্ষে, এটি অপবাদ ছিল। হযরত উমার (রাঃ) তাকে অপবাদের বিধান কার্যকর করার ইচ্ছা করলেন। কিন্তু বলেন- তোমরা দেখ যদি নাভীর নিচে চুল গজিয়ে থাকে তবে তার উপর বিধান কার্যকর কর নচেৎ নয়। যখন দেখা যায় যে, তার সেই চুল গজায় নি তখন তার উপর বিধান কার্যকর করা বন্ধ রাখা হয়। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, সূরা নিসার ৬ নং আয়াতের আলোচনায়, পৃঃ ২৮৭)
- (২) কোন বল প্রয়োগ করে তাকে নাস্তিক হতে বা নাস্তিক'ই কথা বলতে বাধ্য করা হয়েছে কিনা। এটার কারণ, যদি কোন ব্যক্তিকে ইসলাম বিদ্বেষী কথা বার্তা বলতে বাধ্য করা হয় অথবা তাকে নাস্তিকতা করতে বাধ্য করা হয়, তবে এমন কথা বা কাজের জন্য তাকে হত্যা করা যাবে না। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন- "যাকে কুফরীর জন্য বাধ্য করা হয়, কিন্তু তার অন্তরে ঈমানে অবিচলিত"। (সূরা নাহল, আঃ ১০৬)
- (৩) নাস্তিক ব্যক্তিটি পাগল কিনা: যদি ঐ ব্যক্তিটি পাগল হয় তবে তার উপর নাস্তিক হত্যা করার বিধান কার্যকর হবে না। যেমন হাদিসে উল্লেখ আছে যে, তিন প্রকারের লোক হতে কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। ১. শিশু, যে পর্যন্ত না সে প্রাপ্ত বয়স্ক হয়। ২. ঘুমন্ত ব্যক্তি যে পর্যন্ত না সে জেগে উঠে। ৩. পাগল ব্যক্তি, যে পর্যন্ত না তার জ্ঞান ফিরে আসে (তাফসীরে ইবনে কাসীর, সূরা নিসার ৬ নং আয়াতের আলোচনায়, পৃঃ ২৮৬)। অতএব, ঐ ব্যক্তি যদি শিশু না হয়ে প্রাপ্ত বয়স্ক হয়, পাগল না হয়, সুস্থ মস্তিষ্কের হয় এবং তাকে বাধ্য না করা হয়। সুতরাং সে সেচ্ছায় নাস্তিক্যবাদী কথা বা কাজ করছে তবে অবশ্যই সে নাস্তিক হিসেবে গণ্য হবে। এবং তাদেরকে ইমারহর আমীরের কাছে নিয়ে যাবে। অতঃপর আমীরের আদেশে তাদেরকে হত্যা করতে হবে। তবে এক্ষেত্রে আমীর তাদেরকে তিনবার এ কথ বলতে পারেন যে, "তাওবা করে নাও" (সূরা নিসার

১৩৭ নং আয়াতের তাফসীর, পৃঃ ৫৯৮)। যদি তারা তাওবা করে নেয় এবং তাওহীদ গ্রহণ করে ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করে তবে তারা মুসলিমদের দ্বীনি ভাই অর্থাৎ মুমিন হিসেবে গণ্য হবে। যেমন আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, "অতঃপর তারা যদি তাওবাহ্ করে, ছলাত কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে। তবে তারা তোমাদের দ্বীন সম্পর্কের ভাই; জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আমি নিদর্শন স্পষ্টরূপে বর্ণনা করি (সূরা তাওবা, আঃ ১১)। আর যদি তারা তাওবা না করে তবে তারা কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে। (নাউযুবিল্লাহ্)

■ **ব্যতিক্রমী মাসআলা:** যদি মুসলিম রাষ্ট্র হয় যেখানের অধিকাংশ নাগরিকই মুসলিম, যদিও তারা সঠিক ইসলাম সম্পর্কে একেবারেই জ্ঞানহীন। আর সেই রাষ্ট্রে যদি নাস্তিকরা নাস্তিক্যবাদী মতামত ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। সেই দেশের শাসক নামে মুসলিম হলেও ত্বগুতি বিধান তার কর্ম; মুশরিকী মতবাদ লালনকারী; নাস্তিকদের শাস্তি প্রদানের ব্যাপারে গুরুত্বহীন, তাদের নিরাপত্তা দানের ব্যাপারে সক্রিয়। তবে সেই নাস্তিকদের ব্যাপারে করনীয় কি?

করনীয়ঃ সেই নাস্তিকদের মধ্যে দুটি প্রকার দেখতে হবে।

ক. সাধারণ পর্যায়ের নাস্তিক।
খ. রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের বড় নাস্তিক।

সাধারণ পর্যায়ের নাস্তিকদের ব্যাপারে আগে দেখতে হবে তাকে হত্যা করার মাধ্যমে ইসলামের কতটুকু লাভ বা ক্ষতি আছে। কারণ, মুসলিমদের যা কিছু করা সব ইসলামের জন্য। যদি লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হয়। যেমন, একজন সাধারণ নাস্তিককে হত্যা করে ইসলাম বিরোধী শক্তির দ্বারা ডজন মুসলিম ক্রসফায়ার হয়, ১০ জন মুসলিম গুমের স্বীকার হয়, ৫০/১০০ জন মুসলিম বন্দী হয়। আর তা মোকাবেলা করার শক্তি যদি মুসলিমদের না থাকে তবে সেই নাস্তিক হত্যার মাধ্যমে লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি। আর ত্বগুতি শাসনের ছত্রছায়ায় দিন দিন ঐ শ্রেণীর নাস্তিক বাড়তেই থাকবে। তখন আর মুসলিমদের মূল উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে না। কারণ, মুসলিমদের মূল উদ্দেশ্য তো হত্যা নয়; বরং মানুষদেরকে ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণের পথ দেখানো। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা

বলেন, "তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে। তোমরা সৎ কাজে আদেশ কর, অসৎ কাজে নিষেধ কর এবং আল্লাহকে বিশ্বাস করো" (সূরা আলে ইমরান, আঃ ১১০)। উল্লেখিত পরিস্থিতিতে সাধারণ নাস্তিকদের হত্যা করা সঠিক হবে না। তবে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের বড় নাস্তিকদের ক্ষেত্রে ভিন্ন।

₪ মাসআলা নং ০২ (পীরদের ক্ষেত্রে):

পীরদের হত্যা করার পূর্বেও সেই বিষয়টিই দেখতে হবে যেটা নাস্তিকদের হত্যা করার ক্ষেত্রে শর্ত করা হয়েছে। তার সাথে আরো যুক্ত করতে হবে যে, সে পীর এমন ফতুয়া প্রদান করে কিনা (যেমন মুমিনের কলবে আল্লাহর আরশ) এবং সে মানুষদের থেকে সিজদা গ্রহণ করে কিনা। এমন ফতুয়ার মাধ্যমে এই অর্থ দাঁড়ায় যে, ঐ পীর মুমিনদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মুমিন। আর যেহেতু তার কলবে আল্লাহর আরশ রয়েছে সেহেতু আল্লাহর আরশে আল্লাহ্ থাকবে বা আসবে এটাই স্বাভাবিক। অতএব, পীরের কলবে যখন আল্লাহ্ থাকে তখন মানুষ পীরের মাধ্যমে আল্লাহ্কেই সিজদা করবে (নাউযুবিল্লাহ্)। সুতরাং, ঐ সকল মিথ্যা বা ভুল ফতুয়া প্রদান করে তারা মুসলিমদেরকে মুশরিকে পরিণত করেছে অর্থাৎ সে মনে মনে বা ভক্তদের মাঝে নিজেকে আল্লাহ্ হিসেবে উপস্থাপন করেছে। আর ভক্তদের এর মাধ্যমে মুশরিক বানিয়ে ছাঁড়ছে। কাজেই এমন পীর মুরতাদ, কুফরকারী হিসেবে গণ্য হবে। অতএব, তাদের ক্ষেত্রেও মুরতাদদের উপর যেই বিধান, সেই বিধান প্রয়োগ হবে উপরে উল্লেখিত শর্তগুলোর ভিত্তিতে। ঐ প্রকারের মুরতাদ পীরদের ব্যতীত সাধারণ শ্রেণীর পীর অথবা মিথ্যুক অথবা বিদ'আতী পীরকে হত্যা করা নিরর্থক হবে। যেমন, ইবনে সাইয়াদের ব্যাপারে উমার (রাঃ) বলেছিলেন, হে আল্লাহর রসূল (ﷺ), আপনি অনুমতি দিন আমি তাকে হত্যা করবো। তখন আল্লাহর রসূল (ﷺ) উমার (রাঃ) কে বলেছিলো, সে যদি সত্যিই দাজ্জাল হয় তবে তুমি তাকে হত্যা করতে পারবে না। আর সে যদি দাজ্জাল না হয় তবে পথভ্রষ্ট এমনিতেই ধ্বংস হয়ে যাবে, তাকে তুমি হত্যা করো না।

জানা প্রয়োজন যে, আল্লাহর নাবী (ﷺ) এর যুগেই ইয়াহুদীর পুত্র তথা ইবনে সায়্যাদ নিজেকে দাজ্জাল হিসেবে দাবী করেছিল, এমন নিকৃষ্ট ব্যক্তিকেও আল্লাহর

রসূল (ﷺ) হত্যা করতে আদেশ দেননি। তবে সাধারণ শ্রেণীর পথভ্রষ্ট পীরদেরকেও বর্তমান পরিস্থিতিতে হত্যা করার কোন যুক্তিকতাই নেই। আরো একটি জানার বিষয় যে, উপরে উল্লেখিত নাস্তিক মুরতাদদের হত্যার সময় যদি তারা তাওহীদ গ্রহণ করে তবে তাদেরকে ছেড়ে দিতে হবে, হত্যা করা যাবে না।

■ **যদি ঐ মুরতাদ, কাফের জীবন বাঁচানোর জন্য হত্যা হওয়ার ভয়ে তাওহীদ গ্রহণ করে:** যদিও ঐ সকল নাস্তিক, মুরতাদ, কাফেররা জীবন বাঁচানোর জন্য হত্যা হওয়ার ভয়ে তাওহীদ গ্রহণ করে, তবুও তাদেরকে হত্যা করা যাবে না! এ প্রসঙ্গে ওসামা ইবনে যায়দ (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) আমাদেরকে জুহাইনা গোত্রের এক শাখা হুরাকার দিকে পাঠালেন। অতঃপর আমরা সকাল সকাল পানির ঝরনার নিকট তাদের উপর আক্রমণ করলাম। (যুদ্ধ চলাকালীন) আমি ও একজন আনসারী তাদের এক ব্যক্তির পিছনে ধাওয়া করলাম। যখন আমরা তাকে ঘিরে ফেললাম তখন সে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বললো। আনসারী থেমে গেলেন কিন্তু আমি তাকে আমার বল্লম দিয়ে গেঁথে দিলাম। এমনকি শেষ পর্যন্ত তাকে হত্যা করে ফেললাম। অতঃপর যখন আমরা মদিনায় পৌছালাম, তখন নাবী (ﷺ) এর নিকট এ খবর পৌঁছালো। তিনি বললেন, "হে উসামা, তার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার পরেও তুমি তাকে হত্যা করেছো?" আমি বললাম- "হে আল্লাহর রসূল! সে প্রাণ বাঁচানোর জন্য এরূপ করেছে।" পুনরায় তিনি বললেন, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলার পরেও তুমি তাকে হত্যা করেছো?" তিনি আমার সামনে এ কথা বারবার বলতে থাকলেন। এমনকি আমি আকাঙ্খা করলাম যে, যদি আজকের পূর্বে আমি ইসলাম গ্রহণ না করতাম (অর্থাৎ, এখন আমি মুসলমান হতাম)। (বুখারী ও মুসলিম)

অন্য এক বর্ণনায় আছে, রসূল (ﷺ) বললেন, সে কি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে এবং তুমি তাকে হত্যা করেছো? আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! সে কেবলমাত্র এই অস্ত্রের ভয়ে এই (কালেমা) বলেছে'; তিনি বললেন, "তুমি কি তার অন্তর চিরে দেখেছিলে যে, সে এই (কালেমা) অন্তর থেকে বলেছিল কিনা?" অতঃপর একথা পুনঃপুনঃ বলতে থাকলেন। এমনকি আমি আকাঙ্খা করলাম যে, যদি আমি আজ মুসলমান হতাম। (রিয়াদুস সলেহীন, হাঃ ৩৯৮)

অন্য এক হাদিসে বর্ণিত আছে যে, জুনদুব ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (ﷺ) মুসলমান মুজাহিদীনের একটি দল এক মুশরিক সম্প্রদায়ের দিকে পাঠালেন। তাদের পরস্পরের মধ্যে মোকাবেলা হলো। মুশরিকদের মধ্যে একটি লোক ছিল সে যখন কোন মুসলিমকে হত্যা করতে ইচ্ছা করতো তখন সুযোগ পেয়ে তাকে হত্যা করে দিত। (এ অবস্থা দেখে একজন মুসলিম তাকে হত্যা করার জন্য) তার অমনোযোগিতার সুযোগ গ্রহণ করলেন। আমরা পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করছিলাম যে, উনি হলেন উসামা ইবনে যায়দ (অতঃপর যখন সুযোগ পেয়ে) উসামা তরবারি উত্তোলন করলেন, তখন সে বলল, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কিন্তু তিনি তাকে হত্যা করেছিলেন। অতঃপর (মুসলমানদের যুদ্ধে জয়ী হওয়ার সংবাদ নিয়ে) সুসংবাদবাহী রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট এলো, তিনি তাকে (যুদ্ধের ব্যাপারে) জিজ্ঞাসা করলেন। সে তাকে সমস্ত সংবাদ দিল। এমনকি শেষ পর্যন্ত সে ঐ ব্যক্তির খবর অবহিত করলো। তিনি উসামাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে বললেন, "তুমি কেন তাকে হত্যা করেছ?" উসামা বললেন, "হে আল্লাহর রসূল (ﷺ)! সে মুসলমানদেরকে খুবই কষ্ট দিয়েছে এবং অমুক অমুককে হত্যাও করেছে। উসামা কিছু লোকের নামও নিলেন। (এ দেখে আমি তার ওপর হামলা করলাম। অতঃপর সে যখন তরবারী দেখলো তখন বললো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ')"। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, "তুমি তাকে হত্যা করে দিয়েছো? তিনি বললেন, "জী হ্যাঁ"। তিনি বললেন, কিয়ামতের দিন যখন "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" আসবে, তখন তুমি কি করবে? উসামা বললেন "হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমার জন্য (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করুন।" তিনি বললেন- কিয়ামতের দিন যখন "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" আসবে তখন তুমি কি করবে? (তিনি বারংবার একথা বলতে থাকলেন) এবং এর চেয়ে বেশি কিছু বললেন না, "কিয়ামতের দিন যখন "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" আসবে, তখন তুমি কি করবে?" (রিয়াদুস সলেহীন, হাঃ ৩৯৯) অর্থাৎ নাস্তিক, মুরতাদ, কাফেররা যদি অস্ত্রের সম্মুখে পড়ে হত্যার ভয়ে তাওহীদ গ্রহণ করে তবুও তাকে হত্যা করা যাবে না। যদিও সে কিছুক্ষন পূর্বেও মুসলিমদের সাথে স্বশস্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত ছিলো এবং মুসলিমদের অনেককেই হত্যা করেছিলো। তাওহীদ গ্রহণ করার পরেও যদি তাকে হত্যা করা হয় তবে হত্যাকারীর মুমিন হত্যা করার জন্য তাকে দুইভাবে অপরাধী হিসেবে গণ্য করা হবে।

■ (ক) হত্যাকারী হত্যা করার পর উল্লেখিত হাদিস সম্পর্কে অবগত হয়ে সে আল্লাহর নিকট বিনয়ী হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলে এবং ঐ হত্যা করার কারণে সে পরবর্তীতে গর্ববোধ না করলে তার শাস্তি মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার ইচ্ছাধীন থাকবে। অর্থাৎ আল্লাহ্ যদি তাকে ক্ষমা করে থাকেন তবে বিচার দিবসে সেই তাওহীদ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' হত্যাকারীর বিপক্ষে সাক্ষী দিতে আসবে না, ফলে সে হত্যাকারী হিসেবে সাব্যস্ত হবেনা। অর্থাৎ মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা তাকে মাফ করে দিয়েছেন।

■ (খ) যদি হত্যাকারী হত্যা করার কারণে পরবর্তীতে গর্ব করে বেড়ায় আমি অমুক পথভ্রষ্টকে হত্যা করেছি, অমুক পীরকে হত্যা করেছি ইত্যাদি। তাহলে বিচার দিবসে হত্যা হওয়া সেই ব্যক্তির তাওহীদ তার পক্ষে এবং হত্যাকারীর বিপক্ষে সাক্ষী দেবে ফলে হত্যাকারীকে এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হবে সেচ্ছায় মুমিন হত্যার অপরাধে। আর 'তাওহীদ' হত্যাকারীর বিপক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার বিষয়টিই উল্লেখ্য হয়েছে। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন, "কিয়ামতের দিন যখন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' আসবে তখন তুমি কি করবে?" (রিয়াদুস সলেহীন, হাঃ ৩৯৯)। তবে এমন মুমিন হত্যাকারীর কিসাস হবে না যেই ব্যক্তি কুফর অবস্থায় মুমিনদের বিপক্ষে অবস্থান করেছে অথবা মুমিনদের অনেককে জখমী করেছে। ততক্ষনাৎ পরিস্থিতির পরিবর্তনের কারণে অথবা আল্লাহর ভয়ে তাওহীদ গ্রহণ করেছে ঐ অবস্থাতে মুজাহিদ মুমিন তাকে হত্যা করে ফেলেছে। কারণ, এমন অবস্থায় হত্যাকান্ডে আল্লাহর রসূল (ﷺ) কিসাস গ্রহণ করেন নি। বরং কিয়ামত দিবসের ভয় প্রদর্শন করেছেন। আর এমন হত্যার যদি কিসাস হয় তবে কাফেররাই অধিক লাভবান হবে আর ইসলামের ক্ষতি হবে।

প্রশ্ন ও উত্তর - ২

প্রশ্নঃ বাংলাদেশে যে সকল জিহাদ প্রিয় মুসলিম যুবকগণ গোপনে নাস্তিক-মুরতাদ বা ভণ্ড পীরদেরকে হত্যা করার ইচ্ছা পোষণ করে তা কতটুকু যুক্তি সংগত?

উত্তরঃ আমি ব্যতিক্রমী মাসআলা বলে একটি অংশ লিখেছি তা ব্যতীত বাংলাদেশে গোপনে নাস্তিক-মুরতাদ বা ভণ্ড পীরদের হত্যা করার কোন যুক্তিকতাই নেই। তার ক্ষতিকর দিক ও বিধান আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি। এখানে শুধু একটি মাত্র উদাহরণ উল্লেখ করবো। ধরুন, এক গ্রুপ জিহাদ প্রেমিক মুসলিম যুবক কোন নাস্তিক-মুরতাদ অথবা ভণ্ডপীরকে হত্যা করতে গিয়েছে। তারা অনেক কষ্ট করে অনেকের চোখ ফাঁকি দিয়ে নির্দিষ্ট ব্যক্তির নিকটে পৌঁছেছে এবং তাকে হত্যা করার সকল প্রস্তুতি নিয়েছে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, যদি এখন ঐ গ্রুপটি তাকে হত্যা করতে না পারে, তবে ভন্ড ব্যক্তিটি তাদের কথা/তথ্য প্রশাসনকে জানিয়ে দিবে আর হত্যা করলে নিরাপদেও তারা বাড়িতে ফিরতে পারে অথবা অনিরাপদেও। এমতবস্থায় ভন্ড ব্যক্তিটি তাওহীদের বাণী পাঠ করেছে অর্থাৎ মুমিন হওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। এখন গ্রুপটি তো বুঝতে পারছেনা ব্যক্তিটি সত্য-সত্যই ইসলামেই প্রবেশ করলো নাকি জীবন বাঁচানোর জন্য তাদেরকে ধোঁকা দিলো। যদি তাকে ছেড়ে দেওয়া হয় তবে সে প্রশাসনকে অবহিত করতে পারে, যদি সে অন্তর থেকে তাওহীদ গ্রহণ না করে। আবার ইসলামের বিধান হলো, এই ভন্ড ব্যাক্তিটি এখন মুমিন তাকে হত্যা করা যাবে না। এই অবস্থায় সেই জিহাদ প্রেমিক যুবক দলটি সাধারণত ইসলামের বিধানকে অমান্য করে ঐ মুমিন ব্যক্তিকে হত্যা করে বসবে। মূলত সেই হত্যা আল্লাহর জন্য হবে না বরং সেচ্ছায় মুমিনকে হত্যা করা হবে। আর বর্তমানে এটাই হচ্ছে। ঐ সকল জিহাদী গোষ্ঠীর না কোন ইসলামী ভূমি আছে আর না আল্লাহ্ প্রদত্ত কোন অভিভাবক আছে। যার ফলে তারা নিজেরাই হুট-হাট চিন্তা নিয়ে নিজেদের মতের সাথে মতের মিল না থাকার কারণে শরিয়াহর বিধান কার্যকরী করার কোন শর্ত না থাকতেও তারা নাস্তিক-মুরতাদ, ভণ্ডপীরদেরকে হত্যা করেছে, যার ফলে তারা কাবিরাহ্ গোনাহয় লিপ্ত হচ্ছে এবং তাদেরই সেই সেচ্ছাচারিতার কারণে সারাদেশের মুসলিমগণই সঠিক ইসলামকে পূর্ণভাবে জাগ্রত করতে হিমশিম খাচ্ছে, “আল্লাহ্ তাদেরকে মাফ করুন”। এটা তো গেলো নাস্তিক-মুরতাদ ও ভন্ডপীরদের ক্ষেত্রে ঐ সকল

জিহাদ প্রেমীদের অবস্থার কথা। যা খুবই সাধারণ বিষয়। এর চেয়েও ভয়াবহ বিষয় রয়েছে নামধারী জিহাদ প্রেমীদের কিছু কিছু গোষ্ঠিদের মধ্যে। যারা তাদের একে অপরের সাথে মতের মিল না হওয়ার কারণে, একদল আরেক দলের সম্পর্কে সঠিকভাবে না জানা সত্ত্বেও বিদ্বেষবশত তাকফীর করে। একদল আরেকদলকে মুরতাদ দল বলে ফতুয়া প্রদান করে যা তাদের জন্য অত্যন্ত নিন্দনীয় বিষয়। অথচ, তাদের উচিৎ ছিলো কারো বিষয়ে ফতুয়া প্রদান করতে হলে তার সাথে কথা বলে, ভালো-মন্দ সঠিকভাবে যাচাই-বাছাই করে তাকফীরের মূলনীতি সঠিকভাবে বুঝে তার বাহ্যিক আমল তথা- ছলাত, যাকাত, ছিয়াম, হাজ্ব, জিহাদ দেখে তার উপর ফতুয়া প্রদান করা। যেমন, আদুল্লাহ ইবনে উতবাহ্ ইবনে মাসউদ (রহিঃ) বলেন, আমি উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) কে বলতে শুনেছি, আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর যুগে কিছু লোককে ওহী দ্বারা পাকড়াও করা হত। কিন্তু ওহী এখন বন্ধ হয়ে গেছে। (সুতরাং) এখন আমরা তোমাদের বাহ্যিক কার্যকলাপ দেখে তোমাদেরকে পাকড়াও করবো। অতঃপর যে ব্যক্তি আমাদের জন্য ভালো কাজ প্রকাশ করবে তাকে আমরা নিরাপত্তা দেব এবং তাকে আমরা নিকটে করবো। আর তাদের অন্তরের অবস্থার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আল্লাহ্ই তাদের অন্তরের হিসাব নেবেন। আর যে ব্যক্তি আমাদের জন্য মন্দ কাজ প্রকাশ করবে, তাকে আমরা নিরাপত্তা দেব না এবং তাকে সত্যবাদীও মনে করবো না। যদিও সে বলে আমার ভিতর (নিয়ত) ভালো। (রিয়াদুস সলেহীন, হাঃ ৬/৪০০ তাঃ প্রঃ; বুখারী হাঃ ২৬৪১) তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই দেখতে হবে ব্যক্তির ঈমান, আক্বিদাহ ও তাওহীদের বুঝ কী।

এই বিষয়গুলোতে যদি তার পর্যাপ্ত ঘাটতি থাকে ঈমানের পরিবর্তে কুফরের অধিক নিকটবর্তী, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের আক্বিদার পরিবর্তে এর বিপরীত আক্বিদায় অধিক নিকটবর্তী এবং তাওহীদের চেয়ে ত্বগুত বা শিরকের দিকে অধিক নিকটবতী হয় এবং তা যদি সম্পূর্ণ রূপেই বাহ্যিক আমলে প্রকাশ পায় তবে সেক্ষেত্রে ভিন্ন কথা। যেমন গনতন্ত্র, রাষ্ট্রীয় জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, মুশরিকদের সাথে সম্পর্কে সফলতায় বিশ্বাসী, বিধর্মীদের ধর্মনীতি, কাদিয়ানী, আটরশি, চন্দ্রপুরী মতাদর্শে বিশ্বাসী ইত্যাদি। এই সকল পথভ্রষ্টদের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, তাদের অধিকাংশই আল্লাহকে বিশ্বাস করে তবুও তারা

মুশরিক (সূরা ইউসুফ, আঃ ১০৬)। তবে এক্ষেত্রে আরো একটি ভাবার বিষয় আছে যে, কোনো দল বা গোষ্ঠি দলগত ভাবে মুশরিক বা কাফের কিন্তু সেই দলে দু-একজন মুমিন ব্যক্তি থাকতে পারে। ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহিঃ) বলেন, এমন হতে পারে যে, কোন দল দলগতভাবে কাফের কিন্তু তাতে দু'একটি মুমিন থাকতে পারে। আবার কোন দল দলগত ভাবে মুমিন কিন্তু তাতে দু'একজন কাফের থাকতে পারে। (ফাতহুল বারী)

এই মাস'আলাটি কুরআন মাজিদের অধিক নিকটবর্তী। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, ‘‘নগরীর দূর প্রান্ত হতে এক ব্যক্তি ছুটিয়া আসিল ও বলিল, হে মুসা! ফিরআউনের পরিষদবর্গ তোমাকে হত্যা করার পরামর্শ করেছে। সুতরাং তুমি মিশর হতে বাহিরে চলে যাও, আমি তো তোমার মঙ্গলকামী। (সূরা কাসাস, আঃ ২০)

পরাক্রমশালী মহান আল্লাহ তায়ালার পরিচয়

যেহেতু আমরা পরাক্রমশালী মহান আল্লাহ্ তা'য়ালাকেই একমাত্র সত্য ইলাহ্ হিসেবে গ্রহণ করেছি। সেহেতু মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার গুণাগুণ বা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমাদের স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। তা ব্যতীত ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের মতো কোন সৃষ্টিকে তথা মানুষকেই আল্লাহ্ হিসেবে গ্রহণ করে অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট হতে হবে। সেই সকল কাফেরদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, যারা বলে, মারিয়ামের পুত্র মাসীহ্ই আল্লাহ্- তারা তো কুফরী করেছেই। বল, আল্লাহ্ মারিয়ামের পুত্র মাসীহ্, তার মাতা এবং দুনিয়ার সকলকে যদি ধ্বংস করতে ইচ্ছে করেন তবে তাঁকে বাঁধা দিবার শক্তি কার আছে? আসমান ও জমীন এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তার সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্রই। তিনি যাকে ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। (সূরা মায়িদা, আঃ ১৭) অতএব, যাকে তাকেই আল্লাহ্ মনে করে কুফরী করা যাবে না। কারণ, মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার কিছু সুনির্দিষ্ট গুনাগুণ বা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন, উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বলেন যে, মুশরিকরা নাবী (ﷺ) কে বললো, হে মুহাম্মাদ (ﷺ), আমাদের

সামনে তোমার আল্লাহর গুনাগুণ বর্ণনা কর। তখন আল্লাহ্ তা'য়ালা ইখলাস সূরাটি শেষ পর্যন্ত অবতীর্ণ করেন। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, সূরা ইখলাসের আলোচনায়, পৃ: ৩১১; মুসনাদে আহমাদ ৫/১৩৩)

পরাক্রমশালী মহান আল্লাহ তায়ালা মুশরিকদের প্রশ্নের উত্তর নাবী (ﷺ) কে শিখিয়ে দিয়ে বলেন, "বল, তিনি আল্লাহ, এক ও অদ্বিতীয়, আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন। বরং সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী; তিনি কাউকেও জন্ম দেন নাই এবং তাকেও জন্ম দেওয়া হয় নাই এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। (সূরা ইখলাস, আঃ ১-৪)

অতএব, মহান আল্লাহ তায়ালা এমন যে তাঁর কোন অংশীদার নেই। তাঁর সামান্যই হোক বা সমান অথবা বেশিই হোক, কোন পর্যায়ের অংশীদারিত্ব মহান আল্লাহ তায়ালার নেই। তিনি একমাত্র এবং অদ্বিতীয়। পরের আয়াতে আল্লাহ নিজেকে অমুখাপেক্ষী হিসেবে উল্লেখ করেন। আল্লাহ বলেন- আল্লাহুস ছমাদ অর্থাৎ আল্লাহ অমুখাপেক্ষী; একই সাথে এখানে একথাও যুক্ত হয় যে, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। ইমাম ইবনে কাছির (রহিঃ) বলেন, ইকরিমাহ (রহিঃ) ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, 'ছমাদ' তাকেই বলে যার কাছে সৃষ্টির সকল কিছু চাওয়া পাওয়া নির্ভর করে এবং যিনি একমাত্র অনুরোধ পাবার যোগ্য। আলি ইবনে আবি তালহা (রহিঃ) বলেন, ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, 'ছমাদ' হলো ঐ সত্ত্বা যিনি নিজের নেতৃত্বে, নিজের মর্যাদায়, বৈশিষ্ট্যে, নিজের ক্ষমতায়, শ্রেষ্ঠত্বে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের হিকমাতে বুদ্ধিমত্তায়, সবারই চেয়ে অগ্রগণ্য। এই সমস্ত গুণ শুধু মাত্র আল্লাহ তায়ালার মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। তাঁর সমতুল্য ও সমকক্ষ আর কেহ নেই। তিনি পুতঃপবিত্র মহান সত্ত্বা। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তিনি সবার উপর বিজয়ী, তিনি অপরাজেয়। "ছমাদ" এর একটা অর্থ এও করা হয়েছে যে- ছমাদ হলেন তিনি, যিনি মাখলুক ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরও অবশিষ্ট থাকেন। আল আমাশ (রহিঃ) বলেন, শাকীক (রহিঃ) বলেন যে, 'ছমাদ' হলেন ঐ সত্ত্বা, যিনি পৃথিবীর সবকিছু নিজ নিয়ন্ত্রণে রাখেন, কেহ তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। (তাফসীরে ইবনে কাছীর, সূরা ইখলাস এর আলোচনায়, পৃষ্ঠাঃ ৩১৬-৩১৭; তাফসীরে তাবারী ২৪/৬৯২)

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা বলেন, তিনি কাউকে জন্ম দেন নাই এবং তাকেও জন্ম দেওয়া হয় নাই। অর্থাৎ মহান আল্লাহ তায়ালার কোন সন্তান নেই, তা পুত্র হোক বা কন্যা হোক। অতএব, এই আসমান-জমিনের বিশাল রাজত্ব পরিচালনার জন্য আল্লাহর কোন সহযোগী নেই। এবং আল্লাহ তায়ালার রাজত্বে ও ক্ষমতায় কোন মিরাসপ্রাপ্ত ব্যক্তি নেই। আল্লাহর তায়ালার যদি কোন সন্তান থাকতো, তবে তাঁরা মিরাস হিসেবে আল্লাহর রাজত্বে ও ক্ষমতায় অংশীদার থাকতো। আর সেটাই করেছিল অভিশপ্ত জাতি ইহুদী ও খ্রিষ্টানরা যা কুরআন মাজিদে মহান আল্লাহ তায়ালা উল্লেখ করে বলেন, ‘‘ইয়াহুদীগণ বলে উজায়র আল্লাহর পুত্র এবং খ্রিষ্টানগণ বলে মাসীহ আল্লাহর পুত্র। তা তাদের মুখের কথা। পূর্বে যারা কুফুরি করেছিল তাঁরা তাদের মত কথা বলে। আল্লাহ তাদের ধ্বংস করুন। আর কোনদিকে তাদের ফিরাইয়া দেওয়া হয়েছে’’ (সূরা তাওবা, আঃ ৩০)। ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানরা তাদের ঐ বীভৎস কথা দ্বারা কত যে অপরাধ করেছে তা নিম্নের আয়াত থেকে অনুমান করা যায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘‘তাঁরা বলে দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন। তোমরা তো এমন বীভৎস বিষয়ের অবতারণা করেছো, যাতে আকাশমন্ডলী বিদীর্ণ হয়ে যাবে, পৃথিবী খন্ড-বিখন্ড ও পর্বতমন্ডলী চূর্ণ-বিচূর্ন হয়ে আপতিত হবে। যেহেতু তারা দয়াময়ের প্রতি সন্তান আরোপ করে। অথচ, দয়াময়ের জন্য সন্তান গ্রহণ করা শোভনীয় না। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে দয়াময়ের নিকট বান্দারূপে উপস্থিত হবে না’’ (সূরা মারিয়াম, আঃ ৮৮-৯৩)। ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানরা যে কতো বড় মিথ্যাবাদী তা আরো স্পষ্ট করে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, ‘‘তিনি আসমান ও জমিনের স্রষ্টা, তাঁর সন্তান হচ্ছে কীরূপে? তার তো কোন স্ত্রী নেই। তিনি তো সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেক বস্তু সম্পর্কে তিনিই সবিশেষ অবহিত’’ (সূরা আন আম, আঃ ১০১)। অত্র আয়াত থেকে একটি কথা স্পষ্ট যে, মহান আল্লাহ তা'য়ালার কোন স্ত্রী নেই, তা হলে তার সন্তান হবে কীরূপে অর্থাৎ ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানরা আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যারোপ করেছে। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার যে কোন স্ত্রী-সন্তান নেই এই সাক্ষ্যটি অন্য আয়াত থেকেও স্পষ্ট হয়। যেমন কুরআন মাজিদে উল্লেখিত হয়েছে, ‘‘আর নিশ্চয়ই সমূচ্চ আমাদের রবের মর্যাদা, তিনি গ্রহণ করেননি কোন স্ত্রী এবং তার কোন সন্তান নেই’’ (সূরা জ্বিন, আঃ ০৩)। অতএব, অভিশপ্ত ইয়াহুদী খ্রিস্টানরা মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার সন্তান না থাকতেও সন্তান আছে বলে মিথ্যা প্রচারণা

করে। শুধু তাই নয় বরং তারা মহান আল্লাহ তা'য়ালার সৃষ্টির মধ্যে হতেই কিছু সৃষ্টিকে মহান আল্লাহর সন্তান সাব্যস্ত করে নিয়েছে। আর আল্লাহর পরিবর্তে তারা সেই সৃষ্টিরই ইবাদত করে যাচ্ছে। যেমনঃ হযরত ইকরিমা (রহিঃ) বলেন যে, ইয়াহুদীরা বলতো আমরা আল্লাহর পুত্র (নাউযুবিল্লাহ) উযায়ের (আঃ) এর ইবাদত করি। আর খ্রিস্টানরা বলতো আমরা আল্লাহর পুত্র (নাউযুবিল্লাহ) ঈসা (আঃ) এর ইবাদত করি। মাজুসীরা বলতো, আমরা চন্দ্র-সূর্যের ইবাদত করি। আবার মুশরিকরা বলতো, আমরা মূর্তির ইবাদত করি। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা তখন সূরা ইখলাস নাযিল করেন। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, সূরা ইখলাসের আলোচনায়, পৃঃ ৩১৬) মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার যেমন স্ত্রী-সন্তান নেই তেমন পিতা-মাতাও নেই। যে সেই পিতা-মাতা আল্লাহর উপর সম্মানিত ও মর্যাদাশীল হবে। অতএব, মহান আল্লাহ তায়ালার পরেও কেউ উত্তরাধিকার নেই। যে বা যারা আল্লাহ্ তা'য়ালার রাজত্বে ও ক্ষমতায় উত্তরাধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং পূর্বেও কিছু নেই যা অংশীদার বা আল্লাহ্ তা'য়ালার উপর মর্যাদাশীল হবে। কারণ, আল্লাহ্ একক ও অদ্বিতীয়। অতঃপর আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, এবং তার তথা আল্লাহ্ তা'য়ালার সমতুল্য কেউ নেই। অতএব, মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার সাথে সাদৃশ্যে, জ্ঞানে, ক্ষমতায়, রাজত্ব পরিচালনায়, ইচ্ছা পূরণে, ক্ষমা ও শাস্তি প্রদানে অর্থাৎ কোন কিছুতেই সমতুল্য কোন কিছুই নেই। আর আল্লাহ্ই সকল কিছুর একমাত্র স্রষ্টা। আর আল্লাহ্ ব্যতীত সকল কিছুরই কোন না কোনভাবে, কোন না কোন কিছু অংশীদার রয়েছে। আর আল্লাহ্ তা'য়ালা সকল কিছুর একক নিয়ন্ত্রক। যেমন- আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, ‘‘আল্লাহ তিনি ব্যতীত সত্য কোন ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক। তাকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করে না। আসমান ও জমীনে যা কিছু আছে সমস্ত তাঁরই। কে সে, যে তার অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করবে? তাদের সামনে ও পিছনে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত। যা তিনি ইচ্ছে করেন, তা ব্যতীত তার জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ব করতে পারেনা। তার কুরসী আকাশ ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত, তাদের রক্ষণাবেক্ষন তাকে ক্লান্ত করে না। আর তিনি মহান, শ্রেষ্ঠ।’’ (সূরা বাকারাহ্, আঃ ২৫৫)

আর মহান আল্লাহ তা'য়ালার গুনাগুণ-বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি তার ক্ষমতাতেও মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার পরিচয় স্পষ্ট হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ''আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি হতে, অতঃপর শুক্রবিন্দু হতে, অতঃপর তোমাদেরকে করেছেন যুগল। আল্লাহর অজ্ঞাতসারে কোন নারী গর্ভধারণ করেনা এবং প্রসবও করেনা। কোন দীর্ঘায়ু ব্যক্তির আয়ু বৃদ্ধি করা হয়না এবং তার আয়ু কমানো হয়না। কিন্তু তা তো রয়েছে কিতাবে। এটা আল্লাহর জন্য সহজ। দরিয়া দুইটি একরূপও নয়; একটির পানি সুমিষ্ট ও সুপেয়। অপরটির পানি লোনা, খর। প্রত্যেকটি হতে তোমরা তাজা গোশত তথা মৎস্যাহার কর এবং আহরণ কর। অলংকার যা তোমরা পরিধান কর এবং তোমরা দেখ তার বুক চিরে নৌযান চলাচল করে। যাতে তার তথা আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তিনি রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করান এবং দিবসকে প্রবিষ্ট করান রাত্রিতে, তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে করেছেন নিয়মাধীন; প্রত্যেকে পরিভ্রমণ করে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। তিনিই আল্লাহ তোমাদের রব। আধিপত্য তাঁরই এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা তো খেজুর আঁটির আবরনেরও অধিকারী নয়'' (সূরা ফাতির, আ: ১১-১৩)। অন্য এক আয়াতে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, ''আল্লাহই শস্য-বীজ ও আটি অংকুরিত করেন। তিনিই প্রাণহীন হতে জীবন্তকে বাহির করেন এবং জীবন্ত হতে প্রাণহীন কে বাহির করেন। তিনিই তো আল্লাহ্ সুতরাং তোমরা কোথায় ফিরে যাবে? তিনিই ঊষার উন্মেষ ঘটান, তিনিই বিশ্রামের জন্য রাত্রি এবং গননার জন্য সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন। এই সবই পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞের নিরূপণ। তিনিই তোমাদের জন্য নক্ষত্র সৃষ্টি করেছেন যেন তার দ্বারা স্থলের ও সমুদ্রের অন্ধকারে তোমরা পথ পাও। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আমি তো নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করেছি। তিনিই তোমাদেরকে একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য দীর্ঘ ও স্বল্পকালীন বাসস্থান রয়েছে। অনুধাবনকারী সম্প্রদায়ের জন্য আমি তো নিদর্শন সমূহ বিশদভাবে বিবৃত করেছি। তিনিই আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন, অতঃপর তা দ্বারা আমি সর্বপ্রকার উদ্ভিদের চারা উদগম করি; অনন্তর তা হতে সবুজপাতা উদ্‌গত করি। পরে তা হতে ঘন সন্নিবিষ্ট শস্যদানা উৎপাদন করি এবং খেজুর গাছের মাথি হতে ঝুলন্ত কাদি নির্গত করি। আর আঙ্গুরের উদ্যান সৃষ্টি করি এবং যায়তুন ও দারিম্বও (ডালিম)। এরা একে অন্যের সদৃশ্য ও বিসদৃশ্যও। লক্ষ্য

কর, তার ফলের প্রতি যখন তা ফলবান হয় এবং তার পরিপক্কতা প্রাপ্তির প্রতি। মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য তাতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে" (সূরা আনআম, আঃ ৯৫-৯৯)।

অন্য এক আয়াতে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, "তিনিই স্বীয় অনুগ্রহের তথা বৃষ্টির শুরুতে বাতাসকে সুসংবাদবাহীরূপে প্রেরণ করেন। যখন তা ঘন মেঘ বহন করে তখন আমি তা নির্জীব ভূখন্ডের দিকে চালনা করি। পরে তা হতে বৃষ্টি বর্ষণ করি অতঃপর তার দ্বারা সর্বপ্রকার ফল উৎপাদন করি। এইভাবেই আমি মৃতকে জীবিত করি যাতে তোমরা শিক্ষা লাভ কর এবং উৎকৃষ্ট ভূমির ফসল এর রবের আদেশে উৎপন্ন হয় এবং যা নিকৃষ্ট তাতে কঠোর পরিশ্রম না করলে কিছুই জন্মায় না। এইভাবেই আমি কৃতজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন বিভিন্নভাবে বিবৃত করি" (সূরা আরাফ, আঃ ৫৭-৫৮)। যেহেতু একক গুণাবলী, বৈশিষ্ট্য ও ক্ষমতায় এককভাবে রয়েছেন মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা, সেহেতু যুক্তি ও বাস্তবতায় একমাত্র আদেশ দাতাও মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা। আর সেই আদেশও তিনি এককভাবে প্রদান করেন। অন্য কেউ বা কিছুই আদেশ প্রদানেও অংশীদার নেই। যেমন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, "তোমাদের রব আল্লাহ, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন; অতঃপর তিনি আরশে সমুন্নত হন। তিনিই দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন, যাতে তাদের একে অন্যকে দ্রুত গতিতে অনুসরণ করে। আর সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি যা তারই আদেশের অধীন, তা তিনিই সৃষ্টি করেছেন। 'সাবধান' সৃষ্টি যার বিধান-আদেশ চলবে তাঁরই। মহিমাময় বিশ্বজগতের রব আল্লাহ্।" (সূরা আরাফ, আঃ ৫৪)

۩ আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে আক্বিদাহঃ

■ <u>মহান আল্লাহ্ তায়ালার আকার আছে, আল্লাহ্ নিরাকার নয়:</u> এ সম্পর্কে সঠিক আক্বিদাহ হলো- মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার আকার আছে, আল্লাহ্ নিরাকার নয়। যা কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। তবে আকারের স্বরূপ কেমন? আল্লাহর হাত কেমন? আল্লাহর পা কেমন? এ বিষয়ে ততটুকুই আমরা গ্রহণ করবো যতটুকু কুরআন ও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হবে। তবে এ কথাও বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহর আকার আছে ঠিকই কিন্তু কোন কিছুই আল্লাহর সাদৃশ্য নেই। যেমন

আল্লাহ তায়ালা বলেন, "কোন কিছুই তার তথা আল্লাহর সদৃশ্য নয়" (সূরা শূরা, আ: ১১)।
অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "এবং তার তথা আল্লাহর সমতুল্য কেহই নাই" (সূরা ইখলাস, আ: ০৪)। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার আকার আছে এ সম্পর্কে কুরআন মাজীদের অনেক আয়াত রয়েছে এবং ছহীহ্ হাদীস দ্বারাও তা প্রমাণিত হয়েছে। হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) বলেন, একদা পূর্ণিমার রাতে নাবী (ﷺ) আমাদের কাছে বের হয়ে আসলেন। অতঃপর তিনি বললেন, শীঘ্রই তোমরা তোমাদের রবকে কিয়ামাতের দিন দেখতে পাবে যেমন এ চাঁদটিকে তোমরা দেখছো এবং একে দেখতে তোমাদের অসুবিধা হচ্ছে না (ছহীহ বুখারী, হা: ৭৪৩৬)। অতএব, মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার আকার আছে সে জন্যেই আল্লাহ্ তা'য়ালাকে দেখা যাবে। আর আমরা উপরে উল্লেখিত হাদিসটি দ্বারা স্পষ্ট হয়েছি যে, আল্লাহর রসূল (ﷺ) চাঁদ দ্বারা আকারকৃত জিনিস বুঝিয়েছেন। যদি আল্লাহ্ নিরাকার হতেন তবে সেখানে চাঁদের পরিবর্তে বাতাসের উদাহরণ উল্লেখ হতো, যেহেতু বাতাসের কোন আকার নেই। যেহেতু আল্লাহ ও তাঁর রসূল (ﷺ)-মহান আল্লাহ তায়ালার আকার সাব্যস্তও করেছেন এবং কুরআন ও হাদীস দ্বারা আল্লাহর আকারের অসংখ্য বর্ণনা প্রমাণিত হয়েছে, সেহেতু আল্লাহর কথা এবং রসূল (ﷺ)-এর হাদিসকে অমান্য করে 'আল্লাহ নিরাকার' এমন আক্বিদার স্বীকারোক্তি প্রদান করা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করার শামিল। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, "যে ব্যক্তি ইসলামের দিকে এসেও আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে তার চেয়ে বড় জালিম আর কে? আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না" (সূরা ছফ, আ: ০৭)। আল্লাহ সম্পর্কে এমন ভুল আক্বিদাহ পোষণকারী মাসজিদের অনেক ইমাম ও মাহফিলের বক্তাদেরকেই দেখা যায় যারা 'আল্লাহ নিরাকার' বিষয়টি যুক্তি দিয়ে বুঝাতে গিয়ে উদাহরণ উপস্থাপন করে যে, হিন্দু মুশরিকদের ভগবান বা মূর্তি দেবতাদের হাত, পা, নাক, মুখ ইত্যাদি তথা আকার আছে। আর আমাদের সর্বশক্তিমান আল্লাহর কোন আকার নেই তথা আল্লাহ নিরাকার। যদি আল্লাহরও আকার থাকতো তবে তো আকারযুক্ত মূর্তিগুলোর সঙ্গে সাদৃশ্য হয়ে যেত (নাউযুবিল্লাহ্)। অতএব, আল্লাহর আকার নেই। সেহেতু হিন্দুদের দেবতার আকার আর আমাদের আল্লাহও আকার থাকলে তো একই হয়ে গেল। সম্মানিত পাঠক। এমনিতেই তাদের আল্লাহ্ সম্পর্কে আক্বিদাহটি ভূল। তারপরেও

আবার খোড়াযুক্তি আরো বিপদজনক। কারণ, আল্লাহ্ তায়ালার আকার আল্লাহ ও তার রসূল (ﷺ) সাব্যস্ত করেছেন। আর হিন্দু/মুশরিকদের দেবতা আর আমাদের আল্লাহ্ একই কিভাবে হবে? কারণ, দুজনের গুণ-বৈশিষ্ট্য, আর ক্ষমতায় ব্যবধান রয়েছে, রাত আর দিন। সেই বিষয়টি ভালোভাবে বুঝানোর জন্যই উপরে ‘‘আল্লাহর পরিচয়’’ শিরোনামে আলোচনায় উল্লেখ করেছি এবং সামনেও আসবে ইনশাআল্লাহ।

অতএব, আল্লাহর গুণের মধ্যে আল্লাহ নিরাকার হওয়ার কোনো শর্ত নেই। বরং আল্লাহর আকার থাকাটাই শর্ত রয়েছে। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বলেন, নবি (ﷺ) লোক সমাবেশে দাঁড়ালেন এবং মহান আল্লাহর প্রশংসা করলেন। এরপর তিনি দাজ্জাল প্রসঙ্গে বললেন, তার সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে সতর্ক করছি। এমন কোন নাবী নেই যিনি তাঁর জাতিকে এ বিষয়ে সতর্ক করেননি। তবে তার সম্পর্কে আমি তোমাদের এমন একটি কথা বলবো যা কোন নাবীই তার জাতিকে বলেন নি। তা হলো যে সে কানা হবে আর আল্লাহ অবশ্যই কানা নন। অর্থাৎ, আল্লাহর চোখ থাকবে (ছহীহ বুখারী, হাঃ ৭১২৭)।

অন্য এক হাদিসে উল্লেখ্য আছে, দাজ্জালের ডান চোখ কানা হবে (ছহীহ বুখারী, হা: ৭১২৮)। কিন্তু মহান আল্লাহ তায়ালার ডান, বাম দু'চোখই ভালো এবং সর্বদ্রষ্টা। অতএব, আল্লাহ্ তা'য়ালার আকার বর্ণনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

■ <u>মহান আল্লাহর চেহারা আছে:</u> মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, ‘‘আল্লাহর চেহারা ব্যতীত সমস্ত কিছুই ধ্বংসশীল। (সূরা কাসাস, আঃ ৮৮)

■ <u>মহান আল্লাহ্ তায়ালা কথা বলেন:</u> কুরআন মাজিদে বর্ণিত আছে - ‘‘আল্লাহ্ বলিলেন, তোমরা দুই ইলাহ্ গ্রহণ করিওনা। তিনিই তো একমাত্র ইলাহ্। সুতরাং আমাকেই ভয় কর।’’ (সূরা নাহল, আঃ ৫১)

হযরত আলী ইবনে হাতিম (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে শীঘ্রই তার রব কথা বলবেন; তখন রব ও তার মাঝে কোন অনুবাদক ও আড়াল করে এমন পর্দা থাকবে না (ছহীহ বুখারী, হা: ৭৪৪৩)।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, "এবং মূসার সঙ্গে আল্লাহ সরাসরি কথা বলেছিলেন" (সূরা নিসা, আঃ ১৬৪)।

■ <u>মহান আল্লাহ্ তায়ালা দেখেন:</u> আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন, ‘‘আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি স্ববিশেষ দৃষ্টি রাখেন’’।(সূরা মু’মিন, আ: ৪৪)

■ <u>মহান আল্লাহ্ তায়ালা কথা শোনেন:</u> আল্লাহ্ তা’য়ালা বলেন, ‘‘এবং আল্লাহ্ সব শোনেন, সব জানেন’’ (সূরা নূর, আঃ ২১)। অতএব, আল্লাহ্ তা’য়ালা সকল কিছু দেখেন ও শোনেন। অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা’য়ালা বলেন- "তিনি সব কিছু শোনেন ও সব কিছু দেখেন"। (সূরা শূরা, আ: ১১)

■ <u>মহান আল্লাহ্ তায়ালার হাত আছে:</u> আল্লাহ্ তা’য়ালা বলেন "হে ইবলিস! আমি যাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি, তার প্রতি সিজদাবনত হতে তোমাকে কিসে বাঁধা দিল? তুমি কি অহংকার প্রকাশ করলে, না তুমি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন? (সূরা ছ্বদ, আঃ ৭৫)।
ছহীহ বুখারীর ৬ নং খন্ডে তাওহীদ পাবলিকেশন্স এর ৪৯৮ নং পৃষ্ঠার ২১১ নং টিকায় উল্লেখিত আছে যে, অত্র আয়াতে আল্লাহ তা’য়ালার বাস্তব বা প্রকৃত হাত রয়েছে তা প্রমাণিত হয়। কিন্তু তাঁর হাত কেমন এ প্রশ্ন করা যাবে না। অর্থাৎ ধরন, প্রকৃতি মাখলুকের হাতের সাথে তুলনা দেয়া, অস্বীকার করা বা অপব্যাখ্যা করা যাবে না। যেমন বলা হয় হাত দ্বারা উদ্দেশ্য শক্তি, রাজত্ব, নি’আমাত, অঙ্গীকার ইত্যাদি। আবার বলা হয় কুদরতি হাত। এসব মনগড়া ব্যাখ্যা আহলু সুন্নাহ্ ওয়াল জামায়াতের পরিপন্থী। সুতরাং তার প্রকৃত হাত রয়েছে। কুদরতী হাত নয়।

■ <u>মহান আল্লাহ্ তায়ালার দুটি হাত রয়েছে:</u> মহান আল্লাহ্ তা’য়ালা বলেন- ইয়াহুদীরা বলে, আল্লাহর হাত রুদ্ধ; তারাই রুদ্ধ হস্ত এবং তারা যা বলে, তার জন্য তারা অভিশপ্ত বরং আল্লাহর উভয় হস্তই প্রসারিত, যেভাবে ইচ্ছা তিনি দান করেন (সূরা মায়িদা, আঃ ৬৪)।
অত্র আয়াতের সমর্থনে বর্ণিত হাদিসে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহর হাত পূর্ণ, রাত দিন খরচ করলেও তাতে কমতি আসে না। তিনি আরো বলেছেন, তোমরা কী দেখেছো? আসমান-যমীন সৃষ্টি করার পর থেকে তিনি কত খরচ করেছেন, তা সত্ত্বেও তার হাতে যা আছে, তাতে এতটুকু কমেনি এবং নাবী (ﷺ) বলেছেন- তখন তাঁর আরশ পানির উপর

ছিল। তার অন্য হাতে আছে দাঁড়িপাল্লা, যা কখনও তিনি নিচে নামান, আবার কখনও উপরে উঠান (ছহীহ বুখারী, হাঃ ৭৪১১)।

■ <u>মহান আল্লাহ্ তায়ালার হাত কড়া যুক্ত এবং তা মুষ্টিবদ্ধ হয়:</u> আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, অধিক বরকতপূর্ণ, তিনি (তথা আল্লাহ্) সর্বময় কর্তৃত্ব যার করায়ত্ব, তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান (সূরা মূলক, আঃ ০১)।
হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহ্ যমীনকে তার মুঠোয় নিয়ে নেবেন (ছহিহ বুখারী আঃ ৭৪৯৩)।

■ <u>মহান আল্লাহ্ তায়ালার হাত ৫ টী আঙুল বিশিষ্ট:</u> হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন যে, এক ইয়াহুদী নাবী (ﷺ) এর কাছে এসে বলল, হে মুহাম্মাদ! আল্লাহ্ কিয়ামাতের দিনে আসমানকে এক আঙ্গুলের ওপর (১), জমিন গুলোকে এক আঙ্গুলের উপর (২), পর্বতগুলোকে এক আঙ্গুলের উপর (৩), গাছগুলোকে এক আঙ্গুলের উপর (৪), এবং বাকী সৃষ্টিকে এক আঙ্গুলের উপর (৫) তুলে বলবেন, বাদশাহ একমাত্র আমিই। এতে আল্লাহর রসূল (ﷺ) হেসে দিলেন। এমন কি তাঁর মাড়ির দাঁত পর্যন্ত প্রকাশিত হলো। তারপর তিনি তিলাওয়াত করলেন "তারা আল্লাহ্ তায়ালার যথোচিত মর্যাদা উপলব্ধি করেনি" (ছহিহ বুখারী, হাঃ ৭৪১৪)।

■ <u>মহান আল্লাহ্ তায়ালার পা আছে:</u> যখন সমস্ত জাহান্নামীরা- যাদের জন্য স্থায়ী ও অস্থায়ী জাহান্নাম নির্ধারিত হয়েছে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, অতঃপর জাহান্নামের কিছু স্থান বাকি থাকবে তখন জাহান্নাম মহান আল্লাহ্ তা'য়ালাকে বলবেন, আরো জাহান্নামী আছে কি? আমার জায়গা খালি আছে, আরো দাও। তখন মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা তার পা জাহান্নামের মধ্যে নামিয়ে দেবেন, তখন জাহান্নাম পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। যেমন: হাদিসে উল্লেখিত আছে, আনাস (রাঃ) সূত্রে নাবী (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, "লোকদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।" খলীফা ও মুতামির (রহিঃ) আনাস (রা:) সূত্রে- নাবী (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, জাহান্নামীদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে থাকবে। তখন জাহান্নাম বলতে থাকবে আরো বেশি আছে কি? আর শেষে আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন, তাঁর পা জাহান্নামে রাখবেন তখন এর এক অংশ অন্য অংশের সঙ্গে মিশে স্থির হতে থাকবে আর বলবে আপনার ইজ্জত ও করমের কসম! যথেষ্ট

হয়েছে। জান্নাতের কিছু জায়গা শূণ্য থাকবে। অবশেষে আল্লাহ্ সেই শূণ্য জায়গার জন্য নতুন কিছু মাখলুক সৃষ্টি করবেন এবং জান্নাতের সেই খালি জায়গায় এদের বসতি করে দেবেন। (ছহিহ বুখারী, তা প্র হাঃ ৭৩৮৪, আঃ প্রঃ হাঃ ৬৮৬৮, ইঃ ফাঃ হাঃ ৬৮৮০)

■ মহান আল্লাহ্ তায়ালা আরশে সমুন্নত আছেন আর আরশ আছে সপ্ত আসমানের উপরে: সম্মানিত পাঠক, আল্লাহর আরশ সম্পর্কে এক শ্রেণীর ভুল আক্বিদার মানুষ পাওয়া যায়, যারা বলে ও বিশ্বাস করে যে, ‘‘মুমিনের কলবে আল্লাহর আরশ’’ (নাউযুবিল্লাহ)। উক্ত উক্তিটি খুবই জঘন্য এবং কুফরীর শামিল। কারণ, তা সম্পূর্ণ রূপেই কুরআন-সুন্নাহর বিপরীত। যেমন আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, ‘‘আল্লাহ সেই সত্তা, যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান-যমীন এবং এ দুইয়ের মাঝামাঝি মধ্যবর্তী সব কিছু ছয় দিনে, অতঃপর তিনি আরশের উপর সমুন্নত হয়েছেন’’ (সূরা-আস সাজদাহ, আঃ ০৪)। অতএব, মুমিনের কলবে আল্লাহর আরশ উক্তিটি কুফরী উক্তি হিসেবে গণ্য হওয়ার পাশাপাশি শিরকের পথ খুলে দেয়, যা সব চেয়ে বড় পাপ। সম্মানিত পাঠক, আল্লাহর আকার সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য আমার লেখা ‘‘সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ্’’ নামক কিতাবটি সংগ্রহ করে পড়ুন। অতঃপর আমাদের আলোচ্য বিষয় আল্লাহর তাওহীদ সম্পর্কে এবং তার প্রকার সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

তাওহীদের প্রকার

বিদ্বানগণ আল্লাহর তাওহীদকে ৪ প্রকারে আলোচনা করেছেন-

◘ (ক) তাওহীদ আল-আসমা ওয়াছ-ছিফাত অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নাম ও গুণে একত্ববাদী।
◘ (খ) তাওহীদে আর রুবুবিয়াহ্ তথা প্রভুত্বে আল্লাহ্ তা'য়ালার একত্ববাদী।
◘ (গ) তাওহীদ আল ইবাদাহ অর্থাৎ ইবাদত পাওয়ার যোগ্য আল্লাহ্ তা'য়ালার একত্ববাদী।

বিঃ দ্রঃ তাওহীদ আল-হাকিমিয়্যাহ মূলত তাওহীদ আর-রুবুবিয়্যাহ এরই অন্তর্ভুক্ত একটি বিষয় এবং বর্তমান জামানায় সঠিক তাওহীদকে বুঝতে এটিকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন দেখা দেয় বিধায় অনেকে এটিকে আলাদাভাবে সংজ্ঞায়িত করে থাকেন। তবে এখানে তাওহীদ আর-রুবুবিয়্যাহ এর মধ্যেই তা উল্লেখ করা হয়েছে।

۩ তাওহীদ আল-আসমা ওয়াছ ছিফাত অর্থাৎ আল্লাহর নাম ও গুণে একত্ববাদী

তাওহীদ আল-আসমা ওয়াছ ছিফাত হলো আল্লাহ্ তা'য়ালার এসব নাম ও গুণাবলীকে যথাযথ ভাবে মেনে নেয়া যা আল্লাহ্ তায়ালা নিজ সম্বন্ধে তার কিতাবে এবং রসূল (ﷺ) তার হাদিসে বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে আল্লাহ তায়ালা যে সমস্ত নাম ও গুণাবলীকে তার নিজ সম্বন্ধে তার কিতাবে এবং রসূল (ﷺ) তার হাদিসে আল্লাহ্ সম্বন্ধে নিষিদ্ধ বা হারাম করেছেন, তা নিষিদ্ধ মানা। ঐ সমস্ত নাম ও গুণাবলীর কোন অপব্যাখ্যা, উদাহরণ, অস্বীকার, পরিবর্তন অথবা কোন স্বরূপ, (নিজস্ব) কল্পনা করা যাবেনা। আর আল্লাহ্ তা'য়ালার রহমাত, আজাব, আনন্দ প্রকাশ, রাগ হওয়া, কথা বলা, দেখা, শোনা, দুনিয়ার আসমানে নেমে আসা, তিনি সপ্ত আসমানের আরশের উপরে, তাঁর হাত-পা রয়েছে, অন্তর রয়েছে ইত্যাদি কোনো ব্যাখ্যা ছাড়াই ঠিক যেভাবে বর্ণনায় এসেছে, সেভাবেই তা মেনে নিতে হবে। অনুরুপভাবে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার অংশীদার নেই তা সামান্য হোক, সমপরিমাণ হোক বা বেশি হোক। আল্লাহ্ তা'য়ালার পিতা মাতা নেই, স্ত্রী নেই,

সন্তান-সন্তুতি নেই, আল্লাহ তায়ালাকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করেনা, আল্লাহ তা'য়ালার মৃত্যু নেই ইত্যাদি। যা কুরআন হাদীসে নিষিদ্ধ হিসেবে এসেছে তা নিষিদ্ধ হিসেবেই সাব্যস্ত করা। অতএব, মহান আল্লাহ তা'য়ালা নিজের নাম ও গুণাবলী সমন্ধে যেভাবে বর্ণনা করেছেন এবং তার রসূল (ﷺ) আল্লাহ তায়ালা আদেশে আল্লাহ তা'য়ালার নাম ও গুনাবলী যেভাবে বর্ণনা করেছেন। তার বাহিরে আল্লাহর নাম ও গুণাবলী সম্বন্ধে নিজের মনগড়া কোন কথা বা কোন ব্যাখ্যা করা সঠিক নয়। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "আর আল্লাহ্ তার নিজের সম্বন্ধে তোমাদেরকে সাবধান করেছেন।" (সূরা আলে ইমরান, আঃ ২৮)

অর্থাৎ, আল্লাহর নাম ও সিফাত নিয়ে মনগড়া কোনো ব্যাখ্যা করা যাবে না। আবার মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার সুনির্দিষ্ট নাম রয়েছে। সেই নাম ব্যতীত অন্য কোন নামেও আল্লাহ তায়ালাকে ডাকা যাবে না। যেমন 'খোদা' নাম। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার নাম সমূহের মধ্যে 'খোদা' নাম কোথাও নেই। যদিও 'খোদা' নামকে ফারসী, উর্দু ভাষাতে আল্লাহ্ কেও বুঝায় বলে এক শ্রেণীর মানুষ দাবী করে। তবে তাদের সেই দাবিটি অবশ্যই ভুল। কারণ, আল্লাহ্ তা'য়ালার কিছু সুনির্দিষ্ট নাম রয়েছে - তার মধ্যে খোদা শব্দ নেই। অথচ তাওহীদ আল আসমা ওমাছ ছিফাতের দাবী হলো আল্লাহ্ তার নিজের নামে নিজেকে যেভাবে সাব্যস্ত করেছে সেই নামেই সেভাবেই আল্লাহকে ডাকতে হবে। ইবনে হিব্বান ছহীহ সূত্রে বর্ণিত- আল্লাহর রসূল (ﷺ) -এর একটি দু'আয় তিনি বলতেন "আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি প্রত্যেক এমন নামের সাহায্যে, সে নাম আপনিই নিজেই নিজে জন্য রেখেছেন অথবা তা আপনার সৃষ্টির মধ্যে থেকে কাউকে শিক্ষা দিয়েছেন অথবা আপনি তা আপনার কিতাবে নাযিল করেছেন অথবা আপনি তা নিজের কাছে অদৃশ্য ইলমের মধ্যে চিহ্নিত করে রেখেছেন।" (ছহীহ বুখারী তাওহীদ পাবলিকেশন এর ৪৯১ পৃষ্ঠার ২০৯ নং টিকায়)। অতএব মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার যেই সকল নামসমূহ আল্লাহ তার কিতাবে নাযিল করেছেন এবং সৃষ্টির মধ্যে কাউকে তথা নাবী (আঃ)-গণকে শিক্ষা দিয়েছেন। যা বিশ্ব নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ) -এর স্বীকৃতি পেয়েছে তথা কুরআন ও হাদিসে সেই সকল নাম স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে, সেই নাম সমূহের মধ্যে যে নাম ধরে হচ্ছে সেই নামেই আল্লাহকে ডাকা যাবে। যেমন- মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, "বল, তোমরা আল্লাহ্ নামে ডাকো

বা 'রহমান' নামে ডাকো, তোমরা যে নামেই ডাকো সকল সুন্দর নামই তো তার তথা আল্লাহর। (সূরা বাণী ইসরাঈল, আঃ ১১০) অত্র আয়াতটি নাযিলের প্রেক্ষাপট হলো- মুশরিকরা যখন শুনতে পেলো যে, রসূল (ﷺ) আল্লাহ্ তায়ালাকে আহ্বান করেছেন يا الله - يارحمن (ইয়া আল্লাহ, ইয়া রহমান) বলে, তখন তারা বললো যে, মুহাম্মাদ আমাদেরকে এক আল্লাহকে আহ্বান করতে আদেশ দেয় অথচ তিনি দুজন আল্লাহকে আহ্বান করছেন। তখন অত্র আয়াতটি অবতীর্ণ হয় (ছহীহ বুখারী, ৬ষ্ঠ খন্ড, তাঃ প্রঃ, পৃষ্ঠা: ৪৮৩ এর ২০৬ নং টিকায়)।

■ মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার এক কম একশত নাম আছে: হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর আল্লাহ্ তা'য়ালার নিরানব্বইটি তথা এক কম একশটি নাম আছে। যে ব্যক্তি এগুলো মুখস্থ করে রাখবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে (ছহীহ বুখারী, হা: ৭৩৯২)। অনেক মুসলিমকেই দেখা যায় যারা অত্র হাদীসটির ব্যাখ্যা এভাবে নিয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালার উল্লেখিত ৯৯ টি নাম আছে, যে নামগুলো মুখস্থ করে রাখলেই সে জান্নাতে চলে যাবে। প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি তা নয়। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার সেই নামগুলো মুখস্থ রেখে জান্নাতে যাবার কিছু শর্ত আছে। ছহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত একটি হাদিসে, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, "একদিন আল্লাহর রসূল (ﷺ) ছাহাবীগণ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে তোমরা কাদেরকে শহীদ হিসেবে গণ্য কর? তারা জবাবে বললেন, হে আল্লাহর রসূল (সঃ)! যে আল্লাহর পথে (জিহাদ করতে গিয়ে) নিহত হয়, সেই শহীদ। তিনি বললেন, তাহলে তো আমার উম্মাতের শহীদ সংখ্যা নিশ্চিতভাবে কম হবে। তখন তারা জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে শহীদ কারা ইয়া রসূলুল্লাহ (ﷺ)? তখন তিনি বললেন, যে আল্লাহর পথে নিহত হয় সে শহীদ, যে প্লেগ মহামারীতে মারা যায় সে শহীদ, আর যে লোক পেটের ব্যাধিতে মারা যায় সেও শহীদ। কোন কোন বর্ণনায় আছে, যে পানিতে ডুবে মারা যায় সেও শহীদ। আবার উল্লেখ্য আছে সে, ভূমি ধ্বসে মৃত ব্যক্তি শহীদ। এখন, একজন মুশরিক অথবা ইসলাম বিদ্বেষী কাফের ভূমিধ্বসে মারা গেলো কিংবা পেটের ব্যাধিতে মারা গেলো - সেও কি শহীদ?

না, এমন কোন মৃত ব্যক্তিকে শহীদ বলা যাবে না। যদিও অত্র হাদিসের সংজ্ঞার সাথে ঐ মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর মিল আছে, তবে ঐ মৃত ব্যক্তিকে আরো তিনটি শর্ত

পূরণ করতে হবে। যদি মৃত ব্যক্তি তিনটি শর্ত পূরণ করে পানিতে ডুবে মারা যায় অথবা ভূমিধ্বসে মারা যায় অথবা মহামারিতে অথবা পেটের ব্যাধিতে মারা যায়, তাহলে সেই ব্যক্তি শহীদ হিসেবে গণ্য হবে এবং উপরোক্ত হাদিসের সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হবে। শর্ত তিনটি নিম্নে উল্লেখ করলামঃ

▪ [১] তাকে 'আল্লাহ্ ও তার রসূল (ﷺ)'-এর প্রতি ঈমান আনয়ন করতে হবে। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, যারা ঈমান আনয়ন করে ও সৎকর্ম করে, তাদের ঈমানের কারণে তাদের প্রতিপালক তাদেরকে পথ নির্দেশ করবেন। তাদের জান্নাতে পাদদেশে ঝর্ণাসমুহ প্রবাহিত হবে। (সূরা ইউনুস, আঃ ০৯)

অতএব, ঈমান আনতে হবে আল্লাহ্ ও তার রসূল (ﷺ)-এর প্রতি। ঈমান না এনে কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে সে কখনোই জান্নাতে প্রবেশ করবে না। যেমন মহান আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, যারা ঈমান আনয়ন করে ও সৎকর্ম করে, তাদেরকে ন্যায় বিচারের সহিত কর্মফল প্রদানের জন্য (হাশরের মাঠে) উপস্থিত করা হবে। এবং যারা কাফের তারা কুফরী করতো বলে তাদের জন্য রয়েছে ফুটন্ত পানীয় ও মর্মন্তুদ শাস্তি। (সূরা ইউনুস, আ:০৪) আর শহীদগণতো তাদের জীবনের বিনিময়ে জান্নাত ক্রয় করেই নিয়েছে।

▪ [২] তাকে 'যুদ্ধ' তথা আল-ক্বিতালের চিন্তায় থাকতে হবেঃ মুশরিক-কাফেররা ঈমান আনয়ন না করে মৃত্যুবরণ করে যার কারণে তারা কোনক্রমেই শহীদ হিসেবে গণ্য হবে না। একইভাবে, একজন মুসলিম যদি গাজওয়া তথা স্বশস্ত্র যুদ্ধের চিন্তা না করে মারা যায় সে ব্যক্তিও শহীদ হিসেবে গণ্য হবে না। যদিও সে পানিতে ডুবে মারা যায় কিংবা ভূমি ধ্বসে মারা যায় কিংবা প্লেগ মহামারীতে মারা যায়। বরং সে নিফাক নিয়ে মুনাফিক হয়ে মারা যাবে (নাউযুবিল্লাহ)। এ প্রসঙ্গে ছহীহ মুসলিমে বর্ণিত হাদিসে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি মারা গেলে অথচ গাজওয়া (তথা আল্লাহর পথে স্বশস্ত্র যুদ্ধ) করল না, আর গাজওয়ার তথা যুদ্ধের চিন্তাও তার মনে উদিত হলো না, সে ব্যক্তি নিফাকের তথা মুনাফিকির একটি স্বভাবের উপর মারা গেল। (বুলুগুল মারাম ১২৫৯; মুসলিম ১৯১০; নাসায়ী ৩০৯৭; আবূ দাউদ ২৫০২)

অত্র হাদিস থেকে একটি বাস্তব বিষয় রয়েছে যে, বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলিমরাই গাজওয়া তথা আল্লাহর জন্য সশস্ত্র যুদ্ধ করাকে রাষ্ট্র-দ্রোহী সন্ত্রাস হিসেবে চিহ্নিত করে। আমি বেশি দূরের কথা বলছি না, সাধারণ এই বাংলাদেশেরই অধিকাংশ মানুষই আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করতে হয় সেই বিষয়টিই জানে না, তার মূল কারণ হলো- এই দেশের চাটুকারী আলেম সম্প্রদায়, যারা মাসজিদে জুমুআর খুতবায়, বাৎসরিক ভাবে ধর্ম নিয়ে ব্যবসা-জলসা-মাহফিলে শুধু মিলাদ-কিয়াম, কিচ্ছা-কাহীনি আজগুবি গল্প করে অর্থ হাতিয়ে নিয়েছে; আল্লাহর পথে যুদ্ধ করা সম্পর্কে কোন কথাই মুসলমানদের মাঝে বলেনি। যদিও কিছু লোক জানে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে হয় তবুও তারা যুদ্ধের ব্যাখ্যা জিহাদ দিয়ে এবং জিহাদের ভুল ব্যাখ্যা বুঝিয়ে আল্লাহর প্রকৃত পথ থেকে লোকদেরকে সরিয়ে রেখেছে এবং নিজেদের দল ভারি করেছে। এদের এমন ঘৃণিত কর্মকেও আল্লাহ্ তা'য়ালা কুফরী পাপের পাশাপাশি স্থান দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, যারা কুফরী করে এবং অপরকে আল্লাহ্ পথ হতে নিবৃত্ত করে। তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ্) তাদের আমল ব্যর্থ করে দেন। (সূরা মুহাম্মাদ, আ: ০১)

তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করা থেকে কর্মীদেরকে নিবৃত্ত করে এবং কর্মীদের মাঝে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করার ব্যাখ্যা প্রদান করে যে- ইল্লাল্লাহ্ ইল্লাল্লাহ্ যিকির করে অন্তর পরিষ্কার ও পবিত্র করাটাই বড় জিহাদ অর্থাৎ এটাই আল্লাহর পথে যুদ্ধ। কেউ বলে গণতন্ত্রের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে এম.পি, মন্ত্রী হয়ে দেশের মানুষের প্রতি নামাজ-যাকাত বাধ্যতামূলক করে দেওয়ার চেষ্টা করার জন্য রাজপথে মিটিং-মিছিল, গণ-সমাবেশ, ঝটিকা মিছিল, হরতাল-অবরোধ করাই আল্লাহর পথে যুদ্ধ। কেউ বলে হঠাৎ করে সারা দেশ থেকে লোকদেরকে নিয়ে রাজধানীতে একত্র হয়ে রাত্রিযাপন করে গণঅভ্যূত্থান করাই আল্লাহর পথে যুদ্ধ। আবার কেউ বলে, মাসজিদ-মিডিয়া বা স্টেজে শিরক-বিদআতের বিরুদ্ধে মঞ্চগরম করা, ছহীহ হাদীসের বক্তব্য দেওয়াই আল্লাহর পথে যুদ্ধ। যদিও তাদের বক্তব্য দ্বারা দেশ থেকে শিরক উৎখাত না হয়ে বরং মোড়ে মোড়ে আরো বড় মূর্তি স্থাপন হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় শিরকের নব্য জন্ম হচ্ছে। আর যখন কোন মুসলিম আল্লাহর জন্য আল্লাহর পথে যুদ্ধের জন্য চিন্তা করে দ্বীন কায়েমের সঠিক পদ্ধতি

অবলম্বন করে। তখন ঠিক এ সকল দল-প্রধান আর গৃহপালিত আলেমরাই তাদেরকে জঙ্গি-সন্ত্রাস বলে আখ্যায়িত করে।

▪ [৩] তাকে যুদ্ধের নিয়্যাতে থাকতে হবেঃ নিয়্যাতের উপরেই সকল কাজের ফলাফল। কাজেই ঐ মৃত ব্যক্তি জীবিত থাকা অবস্থাতেই ঈমানের সহিত যুদ্ধের চিন্তা মাথায় নিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণের নিয়্যাত করে থাকতে হবে। তবেই সে পানিতে ডুবে মারা যাক কিংবা ভূমি ধ্বসে মারা যাক শহীদ হিসেবে গণ্য হবে। তা ব্যতীত নয়। হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলেন, আমি আল্লাহর রসূল (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, নিয়্যাতের উপরেই কর্মের ফলাফল (ছহীহ বুখারী, হাঃ ০১)। অতএব, উপরে উল্লিখিত শহীদের প্রকারভেদ নিয়ে শহীদের সংজ্ঞা বর্ণিত হাদিসটির সংজ্ঞার সাথে কোন ব্যক্তির মৃত্যুবরণের অবস্থা মিলে গেলেও যেমন শহীদী মৃত্যু হবে না, যতক্ষন না পর্যন্ত শর্ত তিনটি পূরণ হবে। ঠিক তেমনই, আল্লাহর নাম মুখস্থ করেই জান্নাত পাওয়া যাবে না। যতক্ষন না পর্যন্ত আল্লাহ্ নাম মুখস্থ করে জান্নাতে যাওয়ার শর্ত পূরণ হবে। আর আল্লাহর নাম মুখস্থ করে জান্নাতে যাওয়ার শর্ত বা হাকিকত হলো- যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করে আল্লাহর ঐ নামগুলো স্বরণ করবে, নাম সমূহের হিফাজত করবে এবং নামের চাহিদা মোতাবেক আমাল করবে, সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে। যা নিম্নে ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করছি।

■ (ক) আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন:

আমি উপরেও উল্লেখ করেছি জান্নাতের আশা করতে হলে প্রধান শর্তই হলো- ঈমান। আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। সে কিতাবধারী হোক অথবা আর যেই হোক। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন - “কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরী করে (তথা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না) তাদেরকে এবং মুশরিকরা জাহান্নামের অগ্নিতে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে। এরাই সৃষ্টির অধম”। (সূরা বায়্যিনাহ, আঃ ০৬)

অর্থাৎ, আল্লাহর প্রতি যারা ঈমান আনবে না, তারা স্থায়ীভাবে জাহান্নামে অবস্থান করবে। আর যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে ও অন্যান্য সব কাজ করবে আল্লাহ্ তা'য়ালা শুধু তাদের জন্যই জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। আল্লাহ্

তা'আলা বলেন, ‘‘যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ। তাদের জন্য প্রতিপালকের নিকট আছে তাদের পুরষ্কার স্থায়ী জান্নাত যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তাঁতে সন্তুষ্ট। এটা তার জন্য, যে তার প্রতিপালককে ভয় করে’’ (সূরা বায়্যিনাহ, আঃ ৭-৮)। অতএব, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা ব্যতীত কারো জন্যই জান্নাত নেই। আর আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার অর্থ হলো, তিনি যে বিষয়ের প্রতি ঈমান আনতে বলেছেন সে বিষয়ের প্রতি ঈমান আনতে হবে এবং তা নির্দ্বিধায় মেনে নিতে হবে। যদি তা নাই হতো তৎকালীন সময়ের আরবের মুশরিকরাও আল্লাহ্ সম্পর্কে জানতো এবং তারা আল্লাহর ক্ষমতা সম্পর্কেও জানতো কিন্তু তাদের সেই জানা কোন ফলপ্রসূ হয় নাই। আরবদের আল্লাহ্ সম্পর্কে অবগত থাকার স্বীকারোক্তি নিয়ে মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে মহান আল্লাহ তা'য়ালা ওয়াহী করেন। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, "তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ্’’ (সূরা যুমার, আঃ ৩৮)। অতএব, আল্লাহর ক্ষমতা সম্পর্কে জানার পরেও আল্লাহকে আল্লাহ্ হিসেবে জানা ও গণ্য করার পরেও তারা আল্লাহ্ ও তার রসূল (ﷺ)-এর দুশমন হিসেবে গণ্য হয়েছে। যা একই আয়াতের নিচের অংশে আল্লাহ্ তা'য়ালা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন- ‘‘বল, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, আল্লাহ্ আমার অকল্যাণ চাইলে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাকো তারা কি সেই অকল্যাণ দূর করতে পারে? অথবা তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করতে চাইলে তারা কি সেই অনুগ্রহকে রোধ করতে পারবে? বল, আমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। নির্ভরকারীগণ আল্লাহর উপর নির্ভর করে’’ (সূরা যুমার, আঃ ৩৮)।

অতএব, মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার প্রতি ঈমান আনা ব্যতীত ও আল্লাহ্ তা'য়ালার নামের অন্যান্য হাকিকত বাস্তবায়ন না করে আল্লাহর নাম শুধু মুখস্থ করে কল্যাণ নেই।

■ (খ) মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার নাম সমূহ স্বরণে রাখার অর্থ এই নেয় যে, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার পর সারাদিন শুধু আল্লাহর নাম ধরে যিকরই করতে হবে। বরং তার অর্থ হলো- মানুষের সকল কাজের মধ্যেই আল্লাহ্ তা'য়ালার নাম সমূহ স্মরণ করতে হবে। যেমন মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, "ছলাত সমাপ্ত

হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করবে ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করবে, যাতে তোমরা সফলকাম হও" (সূরা জুমুআ, আঃ ১০)। অতএব, মানুষ ছলাত সমাপ্ত করেই জমিনে ছড়াইয়া পড়বে তথা জীবন পরিচালনার জন্য জীবিকার সন্ধানে বের হয়ে যাবে, যার যা হালাল পেশা আছে সেই পেশার দিকে। কারন, সেই পেশা ও জীবিকাই হলো আল্লাহর অনুগ্রহ সমূহের মধ্যে একটি। সুতরাং সেই পেশা বা কর্মে উপস্থিত হয়ে বান্দা আল্লাহ তায়ালাকে অধিক স্মরণ করবে। যেন তৎক্ষনাৎ তার অন্তরে আল্লাহ্ তা'য়ালার প্রতি ভয় সৃষ্টি হয়। আর সে যেন আল্লাহর প্রতি ভয়ের কারণে সেই কর্মে দুর্নীতি করতে না পারে। যেমন- একজন কৃষক নিজের জমিনে যত্ন নিয়ে চাষাবাদ করবে এবং ফসল উৎপাদন করবে, সেই ফসল বিক্রয় করে লাভবান হবে। এমতো কাজে যদি কৃষক আল্লাহকে "ইয়া বাছিরু" নামে স্মরণ করেন। যার অর্থ- হে সকল কিছুর দ্রষ্টা তথা আল্লাহ্ সকল কিছু দেখেন তাহলে ঐ কৃষক নিজের জমীনের আগাছা ও আবর্জনা অন্যের জমিনে ফেলতে পারবে না এবং গোপনে অন্যের ফসল উঠিয়ে নিজের ফসলের সাথে মিশিয়ে বাজারে বিক্রয় করে অর্থও সংগ্রহ করতে পারবে না। অথবা একজন শিক্ষক যদি তার শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষা দিতে শুরু করেন বা একজন বক্তা যদি তার শ্রোতাদেরকে ওয়াজ শোনাতে শুরু করেন। এমতো পেশায় যদি তারা আল্লাহকে "ইয়া সামীয়ু" নামে স্মরণ করেন যার অর্থ- হে সকল কিছু শ্রবণকারী তথা আল্লাহ সব কিছু শোনেন। তাহলে ঐ শিক্ষক- তার শিক্ষার্থীদেরকে এমন কিছু শিক্ষা দিতে পারবে না যা ইসলাম সমর্থন করে না কিংবা ইসলামের বিপরীত। আর বক্তাও তার শ্রোতাদের নিকট এমন কোন গল্প কিচ্ছা কাহিনী বলবে না যা কুরআন-সুন্নাহতে নেই বা যা কুরআন-সুন্নাহর ভুল ব্যাখ্যা। আবার, একজন প্রশাসন কর্মকর্তা তার অধিনস্থ সৈনিকদের আদেশ প্রদানের সময় আল্লাহকে 'ইয়া মালিকু' স্মরণ ও কল্পনা করেন। যার অর্থঃ হে মালিক অর্থাৎ বিচার দিবসের একমাত্র মালিক। তাহলে ঐ প্রশাসন কর্মকর্তা তার অধিনস্থ সৈনিকদেরকে অন্যায় আদেশ করতে পারবে না, খিলাফাত প্রতিষ্ঠার চেতনায় উজ্জীবিত মুসলিমগণের প্রতি নির্যাতন করতে বা নির্যাতনের আদেশ করতে পারবে না, তাদের নামে মিথ্যা মামলা তৈরি করে তাতে বডি রিকভারী বা রিকভারী হিসেবে পিস্তল, গুলি, ম্যাগাজিন, বোমা, বিষ্ফোরক দ্রব্য, জিহাদী বই ইত্যাদি দিয়ে যা তাদের নিকট প্রকৃতই পাওয়া যায়নি তা দিয়ে ১৬৪

ধারায় ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট জবানবন্দি নিতে পারবে না। অতঃপর, সেই মুসলিম দীর্ঘ দিন জেল খেটে বের হবার সময় আবার তাকে জেল গেট থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে গ্রেফতার দেখিয়ে আবার জেলে পাঠাতে পারবে না। অথবা একজন সৈনিক বা কনস্টেবল যদি তার কর্মকর্তার আদেশ শোনার সময় "ইয়া রাজ্জাকু" নামে আল্লাহকে স্মরণ ও কল্পনা করে যার অর্থ, হে রিযিকদাতা। অর্থাৎ আল্লাহ্ই একমাত্র রিযিকদাতা। তাহলে সেই কনস্টেবল বা সৈনিক তার কর্মকর্তার অন্যায় আদেশ শুনে মানুষদের প্রতি টর্চারিং করতে পারবে না। সে তার চাকরি হারানোর ভয় করে না। অর্থাৎ যে ব্যক্তি হালাল যে কাজেই নিয়োজিত থাকুক না কেন, সে তার স্থান থেকে আল্লাহকে অধিক স্মরণ করলে তার দ্বারা আর ঐ সকল উপরে উল্লেখিত পাপাচার কর্ম সম্পাদন হবে না। ফলে তারা ইহকাল ও পরকাল উভয় স্থানেই সফলকাম হতে পারবে, ইংশাআল্লাহ। আর আল্লাহর নাম স্মরণ ও কল্পনা করার পরেও যারা উপরে উল্লেখিত পাপাচার অনাচার কাজ সম্পাদন করবে জেনে বুঝে, তাহলে বুঝতে হবে সেই ব্যক্তি প্রকৃতই দুর্ভাগা অথবা তার ঈমানে যথেষ্ট সমস্যা রয়েছে।

■ (গ) আল্লাহ তায়ালার নাম সমূহের হিফাজাত করা:

উপরে উল্লেখিত দুইটি বিষয়ের পর তথা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন ও আল্লাহর নাম সমূহ স্মরণ বিষয়ে আলোচনার পর আল্লাহ্ তা'য়ালার নাম সমূহের হিফাজাত করা প্রসঙ্গে আলোচনা। এক্ষেত্রে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার অত্র নামসমূহ সঠিক দলিল সহ মুখস্থ রাখতে হবে অথবা মুখস্থ রাখার চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ্ তা'য়ালার নামসমূহের সঠিক অর্থ জানতে হবে এবং নাম সমূহের পারিভাষিক অর্থও স্পষ্টভাবে জেনে রাখতে হবে। এটা এ কারণে যে, মহান আল্লাহ তা'আলার নাম সমূহ মূর্খতাবশত অন্য কিছুর প্রতি সাব্যস্ত না করে বসে। যেমন মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার নাম 'ইয়া রাজ্জাকু' যার অর্থ- হে রিযিকদাতা। পারিভাষিক অর্থে আল্লাহ্ তা'য়ালাই একমাত্র রিযিক দাতা। কেউ যদি মূর্খতা বশত বলে অমুক এম.পি চাকরিটা দিয়েছে দেখেই স্ত্রী-সন্তানকে খাওয়াতে পারি। এর পারিভাষিক অর্থ দাঁড়ায়, ঐ এম.পি তার পরিবারের রিযিকদাতা (নাউযুবিল্লাহ)। যা আল্লাহ্ তা'য়ালার নাম ও গুণাবলীতে অংশীদার স্থাপন করা তথা- শিরক।

কেননা আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, আল্লাহ্ই তো রিযিকদান করেন এবং তিনি প্রবল পরাক্রান্ত (সূরা যারিআত, আঃ ৫৮)।

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, পৃথিবীতে বিচরণকারী সকলের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহরই; তিনি তাদের স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থিতি সম্বন্ধে জানেন (সূরা হুদ, আঃ ০৬)।
ইবনে কাসীর (রাহিঃ) বলেন, এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'য়ালা জানিয়েছেন যে, তিনি পৃথিবীতে বিচরণকারী ছোট-বড়, স্থলে চলাচল ও জলে চলাচলকারী সকল প্রাণীর জীবিকার জিম্মাদার। এবং তিনি তাদের স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থিতি সম্পর্কে জানেন। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, সূরা হুদ, আয়াত নং: ০৬ এর আলোচনায় পৃঃ ২১৮)

অতএব, যেখানে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা ছোট থেকে সকল প্রাণীর স্থায়ী-অস্থায়ী বাসস্থান সম্পর্কে জানেন; সেখানে একটি মানুষের অবস্থান জানবেন না? অবশ্যই আল্লাহ্ তা'য়ালা জানেন। আর আল্লাহ্ তা'য়ালাই তাকে রিযিক দান করেন, তাকে কোন হালাল কর্ম করতে আদেশ প্রদানের মাধ্যমে। আর এমনভাবেই আল্লাহ্ তা'য়ালা একটি ছোট প্রাণীকেও রিযিক প্রদান করে থাকেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, "তোমার প্রতিপালক মৌমাছিকে প্রত্যাদেশ দ্বারা নির্দেশ দিয়েছেন। গৃহ নির্মাণ কর পাহাড়ে, বৃক্ষে ও মানুষ যে গৃহ নির্মাণ করে তাতে, এরপর প্রত্যেক ফল হতে কিছু কিছু আহার কর। অতঃপর তোমার প্রতিপালকের সহজপথ অনুসরণ কর। তবে উদর হতে নির্গত হয় বিবিধ বর্ণের পানীয় (তথা বিভিন্ন রং এর মধু) যাতে মানুষের জন্য রয়েছে আরোগ্য। অবশ্যই তাতে রয়েছে নিদর্শন চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য" (সূরা নাহল, আ ৬৮-৬৯)। অতএব, মহান আল্লাহ্ তা'য়ালাই সকল প্রাণীকে রিযিক দান করেন বিভিন্ন কর্ম-পেশার মাধ্যমে। তাই কোন এমপি-মন্ত্রী চাকরি দেওয়ার কারণে তাকে রিযিকদাতা বলা যাবে না। রিযিকদাতা একমাত্র আল্লাহ্ তা'য়ালাই আর ঐ এমপি-মন্ত্রীকেও আল্লাহই রিযিক দান করেন। অতঃপর, যদি কেউ একথা বলে যে- দূর্গা ঘোড়ার পিঠে, হাতির পিঠে কিংবা নৌকায় চড়ে আসার কারণে এ বছর ফসল ভালো হয়েছে (নাউযুবিল্লাহ), সেও তখন মুশরিক হয়ে যাবে। কারণ, ফসল ভালো-মন্দ করার ক্ষমতা দূর্গা বা অন্য কারো নেই। বরং এই সকল ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্

তা'য়ালারই। কিরূপে জমিনে আল্লাহ্ তা'য়ালা ফসল দান করেন সেই বর্ণনাও মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা কুরআন মাজিদের অসংখ্য আয়াতে উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে একটি আয়াত নিম্নে উল্লেখ করছি। আল্লাহ্ বলেন, "তিনিই (তথা আল্লাহ্ই) আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন, অতঃপর তা দ্বারা আমি সর্বপ্রকার উদ্ভিদের চারা উদগম করি, অনন্তর তা হতে সবুজ পাতা উদগত করি, পরে তা হতে ঘন সন্নিবিষ্ট শস্যদানা উৎপাদন করি এবং খেজুর বৃক্ষের মাথি হতে ঝুলন্ত কাঁদি নির্গত করি আর আঙ্গুর বাগান সৃষ্টি করি এবং যয়তুন ও দাড়িম্বও (ডালিম)। এরা একে অন্যের সদৃশ ও তার পরিপক্বতা প্রাপ্তির প্রতি। মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য তাতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে" (সূরা আনআম, আঃ ৯৯)। অতঃপর কোন ব্যক্তি যদি কাউকে 'রাজ্জাক' অর্থ- রিযিকদাতা, "ছামাদ" অর্থ- অমুখাপেক্ষী, "আজীজ' অর্থ- পরাক্রান্ত, 'রহমান' অর্থ- অতি দয়ালু নামে ডাকে তবে আল্লাহ্ তা'য়ালার নাম ও গুণাবলীতে শিরক হবে। তবে কাউকে 'রাজ্জাক' না বলে আব্দুর রাজ্জাক বলতে হবে। কারণ একমাত্র রিজিকদাতা আল্লাহ্ তা'য়ালাই। আর সে একমাত্র রিজিকদাতার গোলাম। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'য়ালার গুণবাচক নামের সাথে মিলিয়ে কেউ নাম রাখলে তার নামের পূর্বে অবশ্যই আব্দ বা আব্দুল, আব্দুর তথা দাস বা গোলাম শব্দ ব্যবহার করতে হবে। যেমন, ছমাদ না রেখে- আব্দুছ ছমাদ ডাকতে হবে। তা ব্যতীত ছমাদ নামে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকলে শিরক হবে। আরো একটা বিষয় যে, মানুষ ছমাদ নামের পরিবর্তে সামাদ নাম রাখে। এটাও গোনাহের কাজ। আর যদি কেউ তাকে আব্দুস সামাদ বলে সম্মোধন করে সে ব্যক্তি শিরক করবে। কারণ, ছমাদ অর্থ অমুখাপেক্ষী। আর আব্দুছ ছমাদ অর্থ অমুখাপেক্ষীর বান্দাহ। আর সামাদ (سمد) মাদ্দা যার অর্থাৎ জমিতে দেওয়া সার। অতত্রব, আব্দুস সামাদ অর্থ জমিতে দেয়া সারের বান্দা বা দাস (নাউযুবিল্লাহ)। কাজেই কোন মানুষের আল্লাহ্ তা'য়ালার গুণবাচক নাম থেকে নাম রাখতে চাইলে অবশ্যই সেই নামের অক্ষর শুদ্ধ উচ্চারণ থাকতে হবে এবং আকার-প্রকারও শুদ্ধ থাকতে হবে। অতএব, মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার নাম ও গুণাবলীতে কাউকে বা কোন কিছুকে শরীক না করে আল্লাহ্ তা'য়ালার নামের শুদ্ধ উচ্চারণ ঠিক রেখে শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ বুঝে আল্লাহ্ তা'য়ালার নাম সমূহ মুখস্থ করা, মুখস্থ রাখার চেষ্টা করাই হলো আল্লাহ্ তা'য়ালার নাম সমূহের হিফাজাত করা।

■ **মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার সুন্দর নাম সমূহের মধ্যে থেকে বাছাই করা ৯৯ নামসমূহ:**

১। الله (আল্লাহ্)

মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, "আল্লাহ্ ব্যতীত সত্য কোন ইলাহ্ নেই" (সূরা আলে ইমরান, আঃ ০২)। 'ইলাহ্' অর্থ বিধানদাতা। অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া সত্য আর কোন বিধানদাতা নেই। কাজেই আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত সংবিধান তথা মানুষের সার্বিক জীবন পরিচালনার একমাত্র জীবন ব্যবস্থা হলো ইসলাম। তা ব্যতীত অন্য কোন সংবিধান বা জীবন ব্যবস্থা গ্রহণ করা শিরক।

২। الرحمن (আর রহমান - দয়াময়)

৩। الرَّحِيم (আর রহীম - অতি দয়ালু)

মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, যিনি দয়াময় ও অতি দয়ালু (সূরা ফাতিহা, আ: ০২)। মহান আল্লাহ তা'য়ালার রহমান গুণ দ্বারাই বিনা কষ্টে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, পাপী, পুণ্যবান নির্বিশেষে সকল জীব মাত্রই যে দয়া পায় তা হলো- পানি, বায়ু, সূর্যকিরণ ইত্যাদি। আর মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার রহীম গুণ দ্বারা পরিশ্রমের বিনিময়ে জীব মাত্রই যে দয়া পায় তা হলো- ক্ষেতের ফসল, প্রাণীর আহার, চারণভূমি, আত্মার বিকাশ ইত্যাদি।

৪। الملك (আল মালিক - সর্বকর্তৃত্বময়, অধিপতি, মালিক)

মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, (আল্লাহ্) বিচার দিবসের মালিক। (সূরা ফাতিহা, আঃ ৩)

আল্লাহ্ বিচার দিবসের একমাত্র মালিক। তিনি তার বান্দাদের ভালো-মন্দ তথা সত্য-মিথ্যা বোঝার জ্ঞান দিয়ে পৃথিবীতে জীবনযাপন করার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আর তাদের প্রয়োজনে যেন পৃথিবীতে জীবন পরিচালনা করতে কোন বাঁধাপ্রাপ্ত না হয় সেজন্য আল্লাহ্ তা'য়ালা পৃথিবীতে অসংখ্য অগণিত নিয়ামত দান করে রেখেছেন। তারপরেও যেই সকল অকৃতজ্ঞ বান্দারা কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করে পাপাচারে লিপ্ত থাকবে তাদের শাস্তি স্বরূপ জাহান্নামে দেয়ার জন্য আর যারা আল্লাহর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে ঈমান ও সৎকর্ম করে মৃত্যুবরণ করবে

তাদেরকে পুরষ্কার স্বরূপ জান্নাত প্রদান করার জন্য আল্লাহ তা’য়ালার একটি দিবস। আর মহান আল্লাহ্ তা’য়ালা সেই বিচার দিবসেরই মালিক।

৫। القدوس (আল কুদ্দুস - অতিপবিত্র)
মহান আল্লাহ্ তা’য়ালা বলেন- তিনি আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত সত্য কোন ইলাহ্ নেই। তিনিই অধিপতি। তিনিই কুদ্দুস। (সূরা হাশর, আঃ ২৩) মহান আল্লাহ তা’য়ালা আল-কুদ্দুস তথা অতি পবিত্র। আল্লাহ্ তা’য়ালার ব্যাপারে কোন কিছু অনুধাবন করা গোনাহের কাজ হবে। কেননা ভুল অনুধাবনের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি কোন মিথ্যা আরোপ হতে পারে। অথচ মহান আল্লাহ্ সকল মিথ্যা বিষয় থেকে অতিপবিত্র।

৬। السلام (আস-সালাম - তিনিই শান্তি)

৭। المؤمن (আল-মুমিন - তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক)

৮। المهيمن (আল-মুহাইমিন - তিনিই রক্ষক)

৯। العزيز (আল আ’জীজ - তিনি পরাক্রমশালী)

১০।الجبار (আল জ্বাব্বার তিনি প্রবল)

১১।المتكبر (আল মুতাকাব্বির - তিনি অতি মহিমান্বিত)
মহান আল্লাহ্ তা’য়ালা বলেন, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতি মহিমান্বিত। (সূরা হাশর, আঃ ২৩)

১২। الخالق (আল খালিক - আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা)

১৩। البارئ (আল-বারি - আল্লাহ্ উদ্ভাবনকর্তা)

১৪।المصور (আল-মুছাউয়িরু - আল্লাহ্ রূপদাতা)
আল্লাহ্ তা’য়ালা বলেন, তিনিই আল্লাহ্ সৃষ্টিকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, রূপ দাতা, তারই সকল উত্তম নাম। (সূরা হাশর, আঃ ২৪) অর্থাৎ, মহান আল্লাহ্ তা’য়ালাই সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা। তিনিই সকল কিছুর উদ্ভাবনকর্তা এবং তিনিই সকল কিছুর

রূপদাতা, তিনি ব্যতীত ঐ সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী আর কেউ থাকতে পারে এমন বিশ্বাস অন্তরে রাখা শিরক।

১৫। الْغَفُور (আল গফুর - অতি ক্ষমাশীল)

মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল। (সূরা নিসা, আ: ৪৩) অর্থাৎ, বান্দা যত বড় অপরাধই করুক না কেন যদি সে বান্দা অপরাধ কিঞ্চিৎ বুঝার পর পরই আল্লাহর নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা করে তবে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করেন। কারণ আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল।

১৬। القهار (আল ক্বহ্হার - পরাক্রমশালী)

মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, যেদিন মানুষ বের হয়ে পড়বে (তাদের কবর থেকে) সেদিন আল্লাহর নিকট তাদের কিছূই গোপন থাকবে না। (আল্লাহ্ তা'য়ালা জিজ্ঞেস করবেন) আজ কর্তৃত্ব কার? আল্লাহরই। যিনি এক পরাক্রমশালী। (সূরা মুমিন, আঃ ১৬)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'য়ালা বিচার দিবসে অবিশ্বাসী, অকৃতজ্ঞ বান্দাদের উপর "ক্বহ্হার' গুণ দ্বারা ফয়সালা করবেন। এ কারণে যে তারা দুনিয়ায় অকৃতজ্ঞ ছিলো।

১৭। الوهاب (আল ওয়াহ্হাব - মহাদাতা)

মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, হে আমার প্রতিপালক, সরলপথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্য লঙ্ঘনপ্রবণ করিও না এবং তোমার নিকট হতে আমাদের করুণা দাও, নিশ্চয়ই তুমি মহাদাতা। (সূরা আলে ইমরান, আ: ০৮)

অর্থাৎ, বান্দার কোন কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হলে মহাদাতা আল্লাহ্ তা'য়ালার নিকটেই চাইতে হবে, অন্য কারো কাছে নয়। তবে এমন কিছু জিনিস যা পরস্পরের কাছেই পাওয়া যায়। যেমন- টাকা-পয়সা, চাল-ডাল, গাড়ি-ঘোড়া, ঘর-বাড়ি ও জামা-কাপড় ইত্যাদি। অবশ্যই উত্তম হবে ঐ জিনিসগুলো প্রথমে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার নিকট প্রার্থনা করা। অতঃপর এমন মানুষের কাছে যার কাছ থেকে চাইলে তা পাওয়া যাবে। এতে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা তার জন্য সেই জিনিসগুলো পাওয়া সহজ করে দিবেন। আর ঐ সকল জিনিস ব্যতীত যা সরাসরি আল্লাহর হাতে থেকেই প্রদান করেন তা অন্য কারো নিকট প্রার্থনা করা শিরক।

যেমন- সন্তান প্রার্থনা করা, পুত্র-কন্যা সন্তান প্রার্থনা করা, সুস্থতা প্রার্থনা করা, বিপদ দূর করার প্রার্থনা করা, হিদায়াত প্রার্থনা করা ইত্যাদি।

১৮। الرزاق (আর রজ্জাক - রিযিকদাতা)
মহান আল্লাহ্ তা’য়ালা বলেন, আল্লাহই তো রিযিক দান করেন এবং তিনি প্রবল পরাক্রান্ত। (সূরা যারিয়াত, আঃ ৫৮) অর্থাৎ রিযিকদাতা হিসেবে একমাত্র মহান আল্লাহ্ তা’য়ালাকেই বিশ্বাস করতে হবে। অন্য কেউ রিযিক দান করতে পারে এমন বিশ্বাস অন্তরে রাখা শিরক।

১৯। السميع (আস-সামীয়ু - সর্বশ্রোতা)

২০। العليم (আল-আ’লীম - সর্বজ্ঞানী)
মহান আল্লাহ্ বলেন, আর তিনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞানী। (সূরা বাকারাহ্, আ: ১৩৭)

২১। البصير (আল বাছীর - সর্বদ্রোষ্টা)
মহান আল্লাহ্ তা’য়ালা বলেন, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রোষ্টা। (সূরা শূরা, আ: ১১)

২২। الحكم (আল হাকীম - প্রজ্ঞাময়)
আল্লাহ্ তা’য়ালা বলেন, তিনিই মাতৃগর্ভে যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের আকৃতি গঠন করেন। তিনি ব্যতীত সত্য কোন ইলাহ্ নেই। তিনি প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা আলে ইমরান, আঃ ০৬)

২৩। الخبير (আল খাবীর - সকল কিছু অবহিত)
মহান আল্লাহ্ তা’য়ালা বলেন, তোমরা যা কর আল্লাহ তো সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত। (সূরা নিসা, আঃ ৯৪)
অর্থাৎ বান্দা ভালো মন্দ যা কিছু কর্মই করুক না কেন, মহান আল্লাহ্ তা’য়ালা তার সকল কিছুরই খবর রাখেন, যা অন্য কেউ কোন মাধ্যম যেমন আল্লাহর বার্তা, মিডিয়া, ফোন, নেট, লোক মাধ্যম ইত্যাদি ছাড়া পারেনা। যদি কেউ ভাবে পীর, বুজুর্গগণ তা পারে তবে এই বিশ্বাস হবে শিরক।

২৪। الحليم (আল হালীম - সহনশীল)
মহান আল্লাহ্ তা’য়ালা বলেন, আল্লাহ্ ক্ষমা পরায়ন, সহনশীল। (সূরা বাকারহ্, আঃ ২২৫)

২৫। العلي (আল-আলীয়্যু - অতি মহান)

২৬। العظيم (আল-আজীম - শ্রেষ্ঠ)
মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, আর তিনি অর্থাৎ আল্লাহ্ মহান, শ্রেষ্ঠ। (সূরা বাকারাহ্, আ: ২৫৫)

২৭। الشكور (আশ-শাকুর - গুণগ্রাহী)
আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, যে উত্তম কাজ করে আমি তার জন্য তাতে কল্যাণ বৃদ্ধি করি। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী। (সূরা শূরা, আঃ ২৩)

২৮। المقيت (আল-মুক্বীত - সকল বিষয়ে নজরকারী)
মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, আল্লাহ্ তা'য়ালার সকল বিষয়ে নজর রাখেন। (সূরা নিসা, আ: ৮৫)

২৯। الحسيب (আল হাসীব - হিসাব গ্রহণকারী)
মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী। (সূরা নিসা, আঃ ৮৬)

৩০। الودود (আল-ওয়াদুদ - প্রেমময়)

৩১। المجيد (আল-মাজীদ - মর্যাদাসম্পন্ন)
মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, এবং তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময়, আরশের অধিকারী ও মর্যাদা সম্পন্ন। (সূরা বুরুজ, আ: ১৪-১৫)

৩২। الوكيل (আল ওয়াকীল - সমস্ত কিছুর কর্মবিধায়ক)
মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, আল্লাহ্ সমস্ত কিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সমস্ত কিছুর কর্মবিধায়ক। (সূরা যুমার, আঃ ৬২)

৩৩। المتين (আল-মাতীন - পরাক্রান্ত)
মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, আল্লাহই তো রিযিক দান করেন এবং তিনি প্রবল পরাক্রান্ত। (সূরা যারিয়াত, আঃ ৫৮)

৩৪। الولي (আল ওয়ালী- অভিভাবক)

মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, যারা মুমিন, আল্লাহ্ তাদের অভিভাবক। (সূরা বাকারহ্, আঃ ২৫৭)

৩৫। الغني (আল-গণীয়ু, অভাবমুক্ত)

৩৬। الحميد (আল-হামীদ, প্রশংসিত)
মহান আল্লাহ্ বলেন, এবং জেনে রাখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অভাবমুক্ত প্রশংসিত। (সূরা বাকারাহ, আঃ ২৬৭)

৩৭। الحي (আল-হাইয়ূ - চিরঞ্জীব)

৩৮। القيوم (আল ক্বাইয়ুম - সর্বসত্তার ধারক)
মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত সত্য কোন ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক। (সূরা বাকারাহ, আঃ ২৫৫)

৩৯। الصمد (আছ-ছমাদ - অমুখাপেক্ষী)
মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, বল তিনিই আল্লাহ্ এবং অদ্বিতীয়, আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী। (সূরা ইখলাছ, আঃ ১-২)

৪০। القادر (আল-ক্বাদীর - সর্বশক্তিমান)
মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। (সূরা বাকারহ্, আ: ২০)

৪১। المقتدر (আল-মুক্বতাদির - সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী)
মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন- যোগ্য আসনে সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী আল্লাহর সান্নিধ্যে। (সূরা ক্বমার, আঃ ৫৫)

৪২। الأول (আল-আওয়ালু - তিনি আদী)

৪৩। الأخر (আল-আখির - অতিঅন্ত)

৪৪। الظاهر (আজ-জ্বহির - প্রকাশিত)

৪৫। الباطن (আল-বাত্বিন - গুপ্ত)

মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, তিনিই আদী, তিনিই অন্ত; তিনিই প্রকাশিত ও তিনিই গুপ্ত এবং তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। (সূরা হাদীদ, আঃ ০৩)

৪৬। التواب (আত-তাও-ওয়াবু - তাওবা কবুলকারী)
মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, নিশ্চয়ই তুমি তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু। (সূরা বাকারাহ, আঃ ১২৮)

৪৭। المنتقم (আল-মুংতাক্বিমূন - শাস্তি প্রদানকারী)
মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, যেদিন আমি তোমাদেরকে প্রবলভাবে পাকড়াও করবো, সেদিন নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে শাস্তি প্রদানকারী। (সূরা দুখান, আঃ ১৬)

৪৮। العفو (আল-আফুয়্যূ - দোষ মোচনকারী)
মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, তবে আল্লাহও দোষ মোচনকারী, শক্তিমান। (সূরা বাকারা, আঃ ১৪৯)

৪৯। الغفار (আল গফফার - ক্ষমাশীল)
মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, জেনে রাখ যে, তিনি পরাক্রমশালী ক্ষমাশীল। (সূরা যুমার, আঃ ০৫)

৫০। الرؤوف (আর রউফ - অতি দয়ার্দ্র)
মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মানুষের প্রতি অতি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু। (সূরা বাকারাহ্, আ: ১৪৩)

৫১। البديع (আল বাদিইয়ু - অস্তিত্ব দানকারী)
মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, আল্লাহ্ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী (অনস্তিত্ব থেকে) অস্তিত্ব আনয়নকারী। (সূরা বাকারাহ, আঃ ১১৭)

৫২। الكبير (আল কাবীর - অতি উর্ধ্বে)
মহান আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, তিনি পবিত্র, মহিমান্বিত এবং তারা যা বলে তা হতে তিনি অতি উর্ধ্বে। (সূরা বানী ইসরাঈল, আ: ৪৩)

৫৩। القوي (আল ক্বউই-উ - শক্তিমান)
মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শক্তিমান, শাস্তিদানে কঠোর। (সূরা আনফাল, আঃ ৫২)

৫৪। مالك الملك (মালিকাল মুলক - সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক)

৫৫। المعز (আল-মুই'জ্ব - ইজ্জত দানকারী)

৫৬। المذل (আল-মুজিল্লু - অপমানকারী)
মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন- বল, হে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ্! তুমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান কর এবং যার নিকট হতে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নাও, যাকে ইচ্ছা তুমি ইজ্জত দান কর, আর যাকে ইচ্ছা তুমি হীন কর, কল্যাণ তোমার হাতেই। নিশ্চয়ই তুমি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। (সূরা আলে ইমরান, আঃ ২৬) অর্থাৎ, সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ্ ব্যতীত কোন রাষ্ট্রের শাসক, পণ্ডিত বা জনগণকে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক বিশ্বাস করলে তা স্পষ্ট শিরক হবে।

৫৭। ذو الجلال والإكرام (জুল-জালালি ওয়াল ইকরম - অতি মহিমাময়, মহানুভব)
মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, অবিনশ্বর কেবল তোমার প্রতিপালকের সত্তা, যিনি মহিমাময়, মহানুভব। (সূরা রহমান, আঃ ২৭)

৫৮। الفتاح (আল ফাত্তাহ্ - উন্মুক্তকারী, বিজয়দানকারী, শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী)
মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন- বল, আমাদের রব আমাদেরকে একত্র করবেন। তারপর তিনি আমাদের মধ্যে সঠিকভাবে ফয়সালা করবেন। আর তিনিই শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী ও সম্যক পরিজ্ঞাত। (সূরা সাবা, আঃ ২৬)

৫৯। القابض (আল-ক্ববিদ - সকল কিছু আয়ত্তকারী)

৬০। الباسط (আল-বাছিত্ব - পরিমিতকারী)

৬১। الحفيظ (আল-হাফিজ - হেফাজতকারী)
মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং অবশ্য আমিই তার হেফাজতকারী। (সূরা হিজর, আঃ ০৯)

৬২। الرافع (আর-র-ফিয়ু - উন্নিতকারী)

৬৩। العدل (আল-আ’দলু - ন্যায়বিচারকারী)

৬৪। الجليل (আল-জালিল - পরম মর্যাদার অধিকারী, গৌরবান্বিত)

৬৫। الكريم (আল-কারিম - সম্মানিত)
মহান আল্লাহ্ তা’য়ালা বলেন, হে মানুষ! কিসে তোমাকে বিভ্রান্ত করল তোমার মহানুভব প্রভু সম্পর্কে। (সূরা ইনফিতার, আঃ ৬)

৬৬। الرقيب (আর-রক্বীব - রক্ষণাবেক্ষনকারী)
মহান আল্লাহ্ তা’য়ালা বলেন- হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক নফ্‌স থেকে। আর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে এবং তাদের থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যার মাধ্যমে তোমরা একে অপরের কাছে চেয়ে থাক। আর ভয় কর রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক। (সূরা নিসা, আঃ ০১)

৬৭। المجيب (আল-মুজীব - সাড়াদানকারী)
মহান আল্লাহ্ তা’য়ালা বলেন, আর নিশ্চয় নূহ আমাকে ডেকেছিল, আর আমি কতইনা উত্তম সাড়াদানকারী! (সূরা ছফফাত, আঃ ৭৫)

৬৮। الواسع (আল-ওয়াসিউ - প্রশস্তকারী)
মহান আল্লাহ্ তা’য়ালা বলেন, পূর্ব-পশ্চিম আল্লাহরই (দিক)। অতএব, তোমরা যে দিকেই মুখ ফেরাও সে দিকেই আল্লাহ রয়েছেন। আল্লাহ তো বিশাল, মহাজ্ঞানী। (সূরা বাকারহ, আঃ ১১৫)

৬৯। الباعث (আল-বা-ই’সূ - প্রেরণকারী)

৭০। الشَّهِيدُ (আশ-শাহীদ - প্রত্যক্ষদর্শী)
মহান আল্লাহ্ তা’য়ালা বলেন, আর যাদের সাথে তোমাদের অঙ্গীকার রয়েছে, তাদেরকে তাদের অংশ দিয়ে দাও। অবশ্যই আল্লাহ সবকিছুরই সাক্ষী (প্রত্যক্ষদর্শী) থাকেন। (সূরা নিসা, আঃ ৩৩)

৭১। الحق (আল-হাক্কু - মহাসত্য)

৭২। المحصي (আল-মুহছি - সংরক্ষণকারী)

৭৩। المبدئ (আল-মুবদিই-য়ূ - সূচনাকারী)

৭৪। المحيي (আল-মুহইয়্যি - হায়াতদানকারী)
মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, অতএব তুমি আল্লাহর রহমতের চিহ্নসমূহের প্রতি দৃষ্টি দাও। কিভাবে তিনি যমীনের মৃত্যুর পর তা জীবিত করেন। নিশ্চয় এভাবেই তিনি মৃতকে জীবিত করেন এবং তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান। (সূরা রুম, আঃ ৫০)

৭৫। المميت (আল-মুমিতু - মৃত্যুদানকারী)

৭৬। الواجد (আল ওয়াজীদ - অস্তিত্ববান)

৭৭। الواحد (আল-ওয়াহিদ - একত্ববাদ)
মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, (ইউসুফ বলল,) "হে কারাগারের সঙ্গীদ্বয়! পৃথক পৃথক অনেক প্রভু ভাল নাকি পরাক্রমশালী এক আল্লাহ?" (সূরা ইউসুফ, আঃ ৩৯)
নবী (ﷺ) যখন মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ) কে ইয়ামান পাঠালেন তখন তিনি তাঁকে বললেন, তুমি আহলে কিতাবদের একটি কওমের নিকট যাচ্ছ। অতএব, তাদের প্রতি তোমার প্রথম আহ্বান হবে তারা যেন একত্ববাদ আল্লাহকে মেনে নেয় (ছহীহ বুখারী, হাঃ ৭৩৭২)

৭৮। المتعالي (আল-মুতাআ'লি - সুউচ্চ)

৭৯। المقسط (আল-মুক্বছিত্ব - ন্যায়পরায়নকারী)

৮০। المغني (আল-মুগনিইয়ূ - প্রাচুর্যদানকারী)

৮১। المانع (আল-মানিউ - বাঁধা প্রদানকারী)

৮২। الجامع (আল-জামিউ - একত্রিতকারী)

মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, হে আমাদের রব, নিশ্চয় আপনি মানুষকে একত্রিত করবেন এমন একদিন, যাতে কোন সন্দেহ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। (সূরা আলে-ইমরান, আঃ ৯)

৮৩। النافع (আল-নাফিউ - উপকারকারী)

৮৪। النور (আন-নূর - আলোদানকারী)

৮৫। الهادي (আল-হাদী - পথ প্রদর্শক)
মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, আর এভাবেই আমি প্রত্যেক নবীর জন্য অপরাধীদের মধ্য থেকে শত্রু বানিয়েছি। আর পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারী হিসেবে তোমার রবই যথেষ্ট। (সূরা ফুরকান, আঃ ৩১)

৮৬। الباقى (আল-বাক্বী - চিরস্থায়ী)

৮৭। الرَّشِيد (আর-রশিদ - মহাজ্ঞানী)

৮৮। اَلضّارُ (আছ-দ্বর - ক্ষতিদানকারী)

৮৯। الوارث (আল-ওয়ারিস - উত্তরাধিকারী দানকারী)

৯০। الصَّبُور (আছ-ছবুর - মহাধৈর্য্যশীল)

৯১। المؤخر (আল-মুওয়াক্কিরু - পরিসমাপ্তকারী)

৯২। المقدم (আল-মুক্বাদিম - সূচনাকারী)

৯৩। اللطيف (আল-লাত্বীফ - অনুগ্রহদানকারী, সূক্ষ্নদর্শী)
মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, কোন দৃষ্টি তাঁর নাগাল পায় না, তবে তিনি সব দৃষ্টির নাগাল পান। আর তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্নদর্শী ও সবকিছুর খবর রাখেন। (সূরা আন'আম, আঃ ১০৩)

৯৪। المعيد (আল-মুই'দু - ওয়াদা রক্ষাকারী)

৯৫। البر (আল-বাররু - পূণ্যময়ী)

৯৬। الخافض (আল খাফিদু - অবনতকারী, অবিশ্বাসীদের অপমানকারী)

৯৭। المجيد (আল-মাজিদু - সকল-মর্যাদার-অধিকারী, মহিমান্বিত, সম্মানিত) মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, (তারা বলল,) 'আল্লাহর সিদ্ধান্তে তুমি আশ্চর্য হচ্ছ? হে নবী পরিবার, তোমাদের উপর আল্লাহর রহমত ও তাঁর বরকত। নিশ্চয় তিনি প্রশংসিত সম্মানিত'। (সূরা হুদ, আঃ ৭৩)

৯৮। الحكم (আল-হাকামু - হুকুমদাতা)

৯৯। الوالي (আল-ওয়ালিই - বন্ধু)

উপরে উল্লেখিত মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার নামসমূহের শাব্দিক অর্থ ও পারিভাষিক অর্থ বুঝে মুখস্থ করতে হবে এবং সেই নাম সমূহের সঠিক দলীল জানতে হবে। যার মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার নাম সমূহের হিফাজাত করা হবে।

আরো একটি বিষয় যে, শহর/গ্রামের মানুষগণ তাদের সন্তানদের কিছু নাম রাখে, সেই নামগুলো রাখা যাবে না। যেমনঃ শান্তি, তুকাজ্জিবান, শাহিন শাহ্ , গাউসুল আজম ইত্যাদি। কারণ যদি কেউ তার সন্তানের নাম শান্তি রাখলো এবং কেউ একজন এসে ডাক দিলো এখানে শান্তি আছে? একজন বলে উঠলো, এখানে শান্তি নেই। যা হবে একটি কুফরী বাক্য।

◘ জানা প্রয়োজনঃ

১। যদি অভিভাবক সন্তানের নাম রাখে আব্দুর রহমান, আর কেউ যদি তাকে শুধু রহমান বলে ডাকে, তাহলে সে তাকে আল্লাহর সিফাতী বা গুণবাচক নাম ধরেই ডাকলো, সুতরাং যে আব্দুর রহমানকে শুধু রহমান বলে ডাকবে সে ব্যক্তি গোনাহগার হবে।

২। আর যদি কোন অভিভাবক সন্তানের নাম আব্দুর রহমান না রেখে শুধু রহমান রাখে, তবে যে ব্যক্তি তাঁকে রহমান নামে ডাকবে এবং যে.ব্যক্তি শুধু রহমান নাম রেখেছে তারা উভয়ে গোনাহগার হবে।

৩। আর যদি অভিভাবক সন্তানের নাম আব্দুর রহমান রাখে আর সেই অভিভাবকই যদি রহমান নাম ধরে ডাকে, তবে যে বা যতো ব্যক্তি তাকে রহমান নাম ধরে ডাকবে, নাম যে রেখেছে সে এবং যে ডেকেছে- সে উভয়ই সমান গোনাগার হবে।

■ (ঘ) আল্লাহ্ তা'য়ালার নামের চাহিদা মোতাবেক আমাল করা:

যদি এমন হয় যে, একজন ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'য়ালার গুণবাচক নাম সমূহের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থসহ নাম দলিলসহ মুখস্থ করলো অথচ মালিকুল মুলক তথা সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহকে বাদ দিয়ে, বা আল্লাহর পাশাপাশি অন্য কাউকেও গ্রহণ করলো, তাহলে এটা আল্লাহ্ তা'য়ালার নামের চহিদা মোতাবেক আমাল করা হবে না। অতএব, আল্লাহর নাম সমূহের একটি নাম মালিকুল মূলক-এর চাহিদা মোতাবেক আমাল করা হলো- অত্র নামের দলিল সহ নাম, নামের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ বুঝে মুখস্থ করা এবং সেই নামের আমাল করার চেষ্টা করা। যেমন কেউ বললোঃ সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক জনগণ। তখন সেই উক্তিকে কুফরী উক্তি জানা, ঐ মতাদর্শকে কুফরী মতাদর্শ হিসেবে জানা এবং এই মতাদর্শের পরিবর্তে সেখানে ইসলামের মতাদর্শ তথা সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য হত্যা করা বা হত্যা হওয়া অর্থাৎ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করা।

এরূপভাবে, মহান আল্লাহ্ তায়ালার সকল গুণবাচক নামেরই চহিদা মোতাবেক আমাল করতে হবে এবং মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার নিকট প্রার্থনা করা ও আশ্রয় চাওয়ার জন্যও মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার নামগুলোর সাহায্যেই তা করতে হবে। যেমন: হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন- "তোমরা কেউ বিছানায় গেলে তখন যেন সে তার কাপড়ের আচল দিয়ে তা তিনবার ঝেড়ে নেয়। আর বলে- হে আমার প্রতিপালক! একমাত্র তোমারই নামে আমার শরীর পিষ্ঠদেশ বিছানায় রাখলাম এবং তোমারই সাহায্যে আবার তা উঠাবো। তুমি যদি আমার জীবন আটকে রাখ, তাহলে তাকে ক্ষমা করে দিবে। আর যদি তা ফিরিয়ে দাও, তাহলে তোমার নেককার বান্দাদেরকে যেভাবে হিফাজত কর, সেভাবে তার হিফাজত করবে।" (ছহীহ বুখারী, ৬ষ্ঠ খন্ড, হা: ৭৩৯৩)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন- তোমাদের কেউ যখন স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে ইচ্ছা করে এবং সে বলে- আল্লাহর নামে শুরু করছি। হে আল্লাহ্! আমাদেরকে শয়তান থেকে দূরে রাখুন এবং আপনি আমাদের যে রিযিক দেন তা থেকে শয়তানকে দূরে রাখুন এবং উভয়ের মাধ্যমে যদি কোন সন্তান নির্ধারণ হয় তাহলে শয়তান কখনো তার ক্ষতি করতে পারে না। (ছহীহ্ বুখারী, হাঃ ৭৩৯৬)

হযরত আদী ইবনে হাতিম (রাঃ) বলেন- আমি নাবী (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আমি আমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর ছেড়ে দেই। নবী (ﷺ) বললেন, যখন তুমি আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরগুলো ছেড়ে দাও এবং যদি সে কোন শিকার ধরে আনে, তাহলে তা খাও। (ছহীহ্ বুখারী, হাঃ ৭৩৯৭)

◘ মহান আল্লাহ তা'য়ালার গুণবাচক নাম শুধু ৯৯ (নিরানব্বই) টিতেই সীমাবদ্ধ নয়: হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন- আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'য়ালার নিরানব্বইটি, এক কম একশটি নাম আছে। (ছহীহ বুখারী, হাঃ ৭৩৯২)

অত্র হাদিসটি দেখে অনেকেই মনে করেন যে, মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার গুণবাচক নাম শুধু এই নিরানব্বই-টিই। কিন্তু তাদের এই ধারণা সঠিক নয়। যেমন, কেউ যদি বলে আমার কাছে একশত টাকা আছে যা আমি ছদকা করার জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি। এর অর্থ এটা নয় যে, তার কাছে আর অন্য কোন টাকা নেই। বরং তার কাছে টাকা আছে। কিন্তু এগুলো ছদকার জন্য প্রস্তুত করেনি। ছদকার জন্য শুধুমাত্র একশত টাকাই প্রস্তুত করেছে। সুতরাং, হাদিসটির অর্থ হচ্ছে- আল্লাহ তা'য়ালার অসংখ্য নামের মধ্যে থেকে এ ৯৯ টি (নামের) সংখ্যার ফজিলাত হলো- যে ব্যাক্তি ঈমান এনে, এগুলোর যিকির করবে, হিফাজত করবে এবং নামের চাহিদা মোতাবেক আমাল করবে। সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (ছহীহ বুখারী তা.পা, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২০৯ নং টিকা, পৃষ্ঠাঃ ৪৯১)

₪ তাওহীদ আর-রুবুবিয়্যাহ তথা প্রভুত্বে আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদী

তাওহীদ আর রুবুবিয়্যাহ তথা রব্ব হওয়া বা প্রভূত্বে আল্লাহ্ একত্ববাদী। ‘‘রব্ব’’ - তথা প্রভু বা প্রতিপালক বা সর্বোচ্চ কর্তৃত্বশালী। অর্থাৎ, আসমান ও জমীনে যা কিছু আছে তার সকল কিছুর উপরেই সর্বোচ্চ কর্তৃত্বশালী একমাত্র মহান আল্লাহ্ তা’য়ালা। কেননা, সৃষ্টি করা থেকে শুরু করে ধ্বংস করা পর্যন্ত একমাত্র ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব, মহান আল্লাহ্ তা’য়ালারই রয়েছে অন্য কারো বা অন্য কিছুর নেই। যেমন-

■ সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ:

মহান আল্লাহ তা’য়ালা বলেন, আমি তো সৃষ্টি করেছি মানুষকে; সুন্দরতম গঠনে। (সূরা ত্বীন, আঃ ০৪), মহান আল্লাহ্ তা’য়ালা বলেন, তিনি আল্লাহ্ সৃষ্টিকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, রূপদাতা। (সূরা হাশর, আঃ ২৪)

অন্য এক আয়াতে মহান আল্লাহ্ তা’য়ালা বলেন, আর আল্লাহই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা যা তৈরি কর তাও (সূরা ছফফাত; আ: ৯৬)। মহান আল্লাহ্ তা’য়ালা শুধু মানুষ সৃষ্টি করেই রেখে দিয়েছেন তা নয়; বরং তাদের প্রয়োজনে আসমান ও জমীনও সৃষ্টি করেছেন। মহান আল্লাহ্ তা’য়ালা বলেন- তিনিই যথাবিধি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন (সূরা আনআম, আঃ ৭৩)।

অতঃপর আসমান জমীনে মানুষের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তার সুন্দর পরিবেশে জীবন-যাপন করতে তার সব কিছুই মহান আল্লাহ্ তা’য়ালা মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন। মহান আল্লাহ্ তা’য়ালা বলেন, আল্লাহ্ তা’য়ালা পৃথিবীর সব বস্তুকে তোমাদের উপকারের জন্য সৃষ্টি করেছেন। (সূরা বাকারাহ, আ: ২৯) আর মহান আল্লাহ্ তা’য়ালার সেই সকল সৃষ্টির একটিও অপচয় না; বরং তা নির্ধারিত পরিমাপে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ তা’য়ালা বলেন- আমি প্রত্যেক কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে। (সূরা ক্বমার, আ: ৪৯)

■ রিযিকদাতা মহান আল্লাহ:

যেহেতু মহান আল্লাহ, তা'য়ালা বান্দাকে সৃষ্টি করেছেন সেহেতু তাদের এবং তাদের প্রয়োজনে যতো জীব আল্লাহ্ তা'য়ালা সৃষ্টি করেছেন তাদের সকলেরই রিযিকের দায়িত্ব মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা নিয়েছেন। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী সকলের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহরই। তিনি তাদের স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থিতি সম্পর্কে অবহিত, সুস্পষ্ট কিতাবে সব কিছুই আছে। (সূরা হুদ, আঃ ০৬)

অন্য এক আয়াতে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, আল্লাহই তো- রিযিক দান করেন এবং তিনি প্রবল, পরাক্রান্ত। (সূরা যারিয়াত, আঃ ৫৮)

■ বস্ত্রদানকারী মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা:

মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা মানুষের জন্য যেমন রিযিকের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন তেমনিভাবে তাদের লজ্জাস্থান ঢাকার জন্য বা ছতর ঢাকার জন্য লিবাসেরও ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, হে আদম সন্তান! তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকবার ও বেশ-ভূষার জন্য আমি তোমাদের পরিচ্ছদ দিয়েছি। (সূরা আ'রফ, আঃ ২৬)

■ আল্লাহ্ তা'য়ালা বান্দার অন্তরের কথাও জানেন:

মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর বান্দার অন্তরের কথাও জানেন। ফলে বান্দা অন্তরের ভালো-মন্দ কোন কিছুই লুকাতে পারে না। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, 'আল্লাহ্ যখন বলিবেন, হে ঈসা ইবনে মারিয়াম! তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে যে, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত আমাকে ও আমার জননীকে দুই ইলাহ রূপে গ্রহণ কর? সে বলবে, তুমিই মহিমান্বিত! যা বলার অধিকার আমার নেই, তা বলা আমার পক্ষে শোভন নয়। যদি আমি তা বলতাম তবে তুমি তো তা জানতে। "আমার অন্তরের কথাতো তুমি জানো; কিন্তু তোমার অন্তরের কথা আমি জানি না। তুমি তো অদৃশ্য সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত।" (সূরা মায়িদা, আ: ১১৬)

■ মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা অন্তর পরিবর্তনকারী:

মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা শুধু যে বান্দার অন্তরের কথা জানেন তা নয়; বরং অন্তর পরিবর্তনও করতে পারেন। এ প্রসঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বলেন,

নাবী (ﷺ) অধিকাংশ সময় কসম করতেন এ কথা বলে, না, তাঁর কসম, যিনি অন্তরসমূহ পরিবর্তন করে দেন। (ছহীহ্ বুখারী, ৬ষ্ঠ খন্ড, হা: ৭৩৯১)

■ মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা কখনোই ভুল করেন না:

মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন- ফিরাউন বলল, হে মূসা! কে তোমার রব? মূসা বলল, আমাদের রব তিনি, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তাঁর আকৃতি দান করেছেন অতঃপর পথনির্দেশ করেছেন।

■ একমাত্র মহান আল্লাহ্ তা'য়ালাই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান এবং পুনরায় জীবন দান করবেন:

মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, তোমরা কিরূপে আল্লাহকে অস্বীকার কর? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন, তিনি তোমাদের কে জীবন দান করেছেন আবার তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন ও পুনরায় জীবন দান করবেন, পরিণামে তাঁর দিকেই তোমাদেরকে ফিরে আনা হবে। (সূরা বাকারাহ্, আঃ ২৮)

■ কিয়ামাতের দিন মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা ব্যতীত সকল কিছুই ধ্বংস হবে:

সুন্দর রূপে সাজানো এই পৃথিবী, যার মোহে মানুষ তার চিরশত্রু শয়তানের ধোঁকায় পড়ে যায়। সেই পৃথিবীসহ সমস্ত কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে। একমাত্র মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা ব্যতীত। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, তুমি আল্লাহর সহিত অন্য ইলাহকে ডেকো না, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই। আল্লাহর সত্তা ব্যতীত সমস্ত কিছুই ধ্বংসশীল। (সূরা কাসাস, আঃ ৮৮)

■ মৃত ব্যক্তীকে জীবন দান করে বিচার ফয়সালার জন্য উঠাবেন একমাত্র মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা:

মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, যখন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে, তখন তারা কবর হতে বের হয়ে ছুটে আসবে তাদের রবের দিকে। (সূরা ইয়াসীন, আঃ ৫১)

■ বিচার দিবসে একমাত্র মহান আল্লাহ্ তা'য়ালাই পরিপূর্ণ সঠিক বিচারক:

মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, আজ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের ফল দেওয়া হবে; আজ কোন জুলুম করা হবে না, আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে তৎপর। (সূরা মূ'মিন, আঃ ১৭)

■ মহান আল্লাহ্ তা'য়ালাই একমাত্র সূক্ষ্ম বিচারক:

বিচারক হিসেবে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালাই একমাত্র সূক্ষ্ম বিচারক, যিনি বান্দার জাররা পরিমাণ ভালো কাজ-মন্দ কাজও দেখবেন। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, সেই দিন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে বাহির হবে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো যায়, কেঁহ অনু পরিমাণ সৎকর্ম করলে সে তা দেখতে পাবে। আর কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে, সে তাও দেখবে। (সূরা যিলযাল, আঃ ৬-৮)

■ বিচার দিবসে একমাত্র মহান আল্লাহ্ তা'য়ালাই নিখুঁত তথ্য প্রদানের সাক্ষী উপস্থিত কারী:

বিচার দিবসে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালাই পাপীদের তথ্য প্রদানের জন্য এমন নিখুঁত তথ্য প্রদানের সাক্ষী উপস্থিত করবেন যে, পাপীরা হতবুদ্ধি হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন- পরিশেষে যখন তারা তথা পাপীরা জাহান্নামের সন্নিকটে পৌঁছবে তখন তাদের কান, চোখ ও ত্বক তাদের কৃতকর্মের সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবে তাদের বিরুদ্ধে। জাহান্নামীরা (হতবুদ্ধি হয়ে) তাদের ত্বককে জিজ্ঞাসা করবে, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছো কেন? (তথা সাক্ষ্য দিচ্ছো কিভাবে?) উত্তরে তারা বলবে, আল্লাহ্, যিনি আমাদেরকে বাকশক্তি দিয়েছেন, তিনি সমস্ত কিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন, তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন প্রথমবার এবং তারই নিকটে তোমরা প্রত্যাবর্তীত হবে। তোমরা কিছু গোপন করতে না তোমাদের ত্বকের কাছে। এই বিশ্বাসে যে, তোমাদের কান, চোখ ও ত্বক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবেনা (তথা তা কথা বলতে পারে না)। উপরন্তু তোমরা মনে করতে যে, তোমরা যা করতে তার অনেক কিছুই আল্লাহ্ জানেন না। তোমাদের রব সম্বন্ধে তোমাদের এই ধারণাই তোমাদের ধ্বংস এনেছে। ফলে তোমরা হয়েছো ক্ষতিগ্রস্থ। (সূরা হামীম আস-সাজদা, আঃ ২০-২৩)

অতএব, সৃষ্টি হিসেবে সুন্দর গঠনে একমাত্র আল্লাহ্ তা'য়ালাই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর সুন্দর পরিবেশে মানুষের জীবনযাপন করতে যা কিছু প্রয়োজন, তার সবকিছূই তাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা। তার জীবন অতিবাহিত করার জন্য রিযিকের প্রয়োজন সেই রিযিকের ব্যবস্থা করেছেন মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা। তার ইজ্জত মর্যাদা উন্নত বা রক্ষা করতে বস্ত্রের বা পোশাকের প্রয়োজন, সেই পোশাকেরও ব্যবস্থা করে দিয়েছেন মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা। শুধু বাহ্যিক দিক থেকেই মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা ক্ষমতাশালী তা নয়; বরং বান্দার অন্তরের কথাও জানেন মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা এবং তিনি বান্দার অন্তর পরিবর্তনকারীও। তিনি এমনই এক ক্ষমতাবান রব; যিনি কখনোই কোন ভুল করেন না এবং একমাত্র তিনিই জীবন দান করতে পারেন ও মৃত্যু ঘটাতে পারেন। অতঃপর পূনরায় জীবন দান করতে পারেন। যদিও মহা কিয়ামাতে সমস্ত কিছূই ধ্বংস হয়ে যাবে কিন্তু মহান- আল্লাহ্ তা'য়ালা যেমন আছেন তেমনি থাকবেন। আর মৃত ব্যক্তিকে জীবন দান করে বিচার-ফয়সালার জন্যও উঠাবেন, একমাত্র তিনিই। আর একমাত্র মহান আল্লাহ্ তা'য়ালাই পরিপূর্ণ সঠিক বিচারক। একমাত্র তিনিই সূক্ষ্ম বিচার করতে পারেন। সেই বিচারের সময় বান্দা তার একবিন্দু পরিমাণ ভালো কাজ করলে তাও দেখতে পাবে এবং একবিন্দু পরিমাণ মন্দ কাজ করলে তাও সে দেখতে পাবে। আর বিচার দিবসে নিখুঁত তথ্যের জন্য একমাত্র মহান আল্লাহ্ তা'য়ালাই পাপিদের অবাক করা সাক্ষী তথা ত্বক, কান, চোখকে সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত করতে পারবেন। অতএব, যিনি মানুষকে সৃষ্টি থেকে শুরু করে, তাদের মৃত্যু পর্যন্ত এবং তাদের মৃত্যুর পরেও জীবন দান করে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রাতী পরিমাণের ভালো অথবা মন্দ সকল কর্মই উপস্থিত করে পুরষ্কার হিসেবে জান্নাত এবং শাস্তি হিসেবে জাহান্নাম প্রদান করতে একক ভাবে ক্ষমতাবান, সেই পরাক্রমশালী মহান আল্লাহ্ তা'য়ালাই মানুষের প্রতি বিধান প্রয়োগ করতে পারেন নাকি সেই সকল ব্যক্তি বা বস্তুর যারা নিজেরাই মহান আল্লাহর সৃষ্টি অথবা মানুষের দ্বারা সৃষ্টি?

অবশ্যই পরাক্রমশালী মহান আল্লাহ্ তা'য়ালাই। কারণ, একমাত্র স্রষ্টাই জানে, সৃষ্টির কী প্রয়োজন। আর সে জন্যই মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর বান্দাদেরকে বলেন- সাবধান! জেনে রাখ যে, সৃষ্টি যার আর বিধানও চলবে তাঁরই। (সূরা আরাফ, আ: ৫৪)

সুতরাং, বান্দার উপর সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত রাখা বা বান্দাদের প্রতি হুকুমাত চালানোর অধিকার একমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালারই আছে। মানুষের উপর জীবন বিধান প্রদানের অধিকার একমাত্র আল্লাহ্ তা'য়ালারই আছে। আর যে বা যারাই তাদের তৈরি করা বিধান মানুষের জীবন পরিচালনার জন্য নির্ধারণ করে বা করতে চায়- তারাই ত্বগুত, তার বিধানই হলো ত্বগুতি বিধান। আর ঐ সকল ত্বগুত একাধিক হয়ে থাকে। আর ত্বগুতই মানুষের উপর সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব খাটাতে চায় বা মানুষের রব্ব হতে চায়। আর এই পর্যায়ের রব হলো- ইসলাম বিরোধী শাসক। অনেকেই আবার বলতে পারেন শাসক কিভাবে রব্ব হয়? সে তো মানুষের সৃষ্টিকর্তা দাবী করে না? মূলত মিথ্যা রবের দাবীদার হওয়ার জন্য তাকে মানুষের স্রষ্টা হতে হবে, এমন শর্ত নয়; বরং কথা ও কর্ম দ্বারাও ত্বগুতি রব হিসেবে চিহ্নিত হয়। রবের মূল কাজ হলো নিজের প্রণীত বিধান মানুষের উপর প্রদান করা। এক্ষেত্রে সত্য রবের বৈশিষ্ট্য হলো মানুষকে সহ তার প্রয়োজনীয় সকল কিছু সৃষ্টি করে তার উপর, নিজের প্রণীত বিধান প্রদান করা। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেন, সাবধান! জেনে রাখ যে, সৃষ্টি যার আর বিধান চলবে তাঁরই। (সূরা আরাফ, আ: ৫৪)

আর মিথ্যা রব্ব বা ত্বগুতি রবের বৈশিষ্ট্য হলো- সে বা তারা সৃষ্টি না করেই নিজেদের প্রণীত বিধান মানুষের উপর চাপিয়ে দেয়া। আর ঐ সকল মিথ্যা বা ত্বগুতি রবেরই প্রধান হলো ইসলাম বিরোধী শাসক। এই ইসলাম বিরোধী শাসক শ্রেণীর ত্বগুতও রব হওয়া প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন- তোমার নিকট মূসার কথা পৌঁছেছে কী? যখন তার সত্য রব্ব পবিত্র উপত্যকা 'তুওয়ায়' তাকে আহ্বান করে বলেছিলেন, ফিরআউনের নিকট যাও, সে তো ত্বগুত হয়ে গেছে এবং বল, তোমার কি আগ্রহ আছে যে, তুমি পবিত্র হও। আর আমি তোমার রবের দিকে পথ প্রদর্শন করি। অতঃপর সে ফিরাউনকে মহানিদর্শন দেখালো। অতঃপর সে পিছনে ফিরে প্রতিবিধানে সচেষ্ট হলো। ফিরাউন সকলকে সমবেত করলো এবং উচ্চস্বরে ঘোষণা করল আর বলল : (হে মিশরবাসী!) আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ রব্ব। (সূরা নাযিয়াত, আ: ১৫-২৪)

অত্র আয়াত থেকে একথা স্পষ্ট হয় যে, সে একজন ইসলাম বিরোধী শাসক ছিলো। সে মিশরের জনগণের উপর তার বিধান প্রণয়ন করতো এক আল্লাহর

বিধানের পরিবর্তে। মোট কথা, ফিরআউন ত্বগুতি রব্ব ছিলো। সে মানুষের উপর বিধান প্রয়োগ করতো, কিন্তু সে মানুষকে সৃষ্টি করেনি। ত্বগুত-ই রব্ব, তাদের নিজেদের হুকুমাত মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহ্ যে একমাত্র স্রষ্টা তা অস্বীকার করে না, আল্লাহ্ যে লজ্জাস্থান ঢাকার জন্য পোশাকদানকারী সেটাও তারা অস্বীকার করে না, আর তারা আল্লাহকে একমাত্র রিযিক দাতা হিসেবেও প্রকাশ্যে অস্বীকার করেনা। আর আল্লাহই সে একমাত্র জীবন দান করতে পারেন ও মৃত্যু ঘটাতে পারেন তাও তারা প্রকাশ্যে অস্বীকার করে না। এবং আল্লাহ্ তা'য়ালার বিধান যে একেবারেই অগ্রহণযোগ্য তাও তারা বলে না। বরং তারা শুধু মানুষকে বুঝায় আল্লাহর দেয়া বিধানের থেকে মানুষের জন্য তাদের তৈরি বিধানই উত্তম (নাউজুবিল্লাহ্)।

যেমন, মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বিধান দিয়েছেন- পুরুষ চোর এবং নারী চোর, তাদের হাত কর্তন কর এটা তাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহর পক্ষ হতে আদেশ দন্ড। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় (সূরা মায়িদাহ, আঃ ৩৮)। আর ত্বগুত বলল, একটি মানুষ চুরি করে তার যদি হাতটিই কাঁটা হয় তাহলে তো তার আর কর্ম করার অবস্থা থাকবে না, ফলে বিশৃঙ্খলা হবে রাষ্ট্রে। তাই আল্লাহর বিধানের পরিবর্তে ত্বগুত বিধান দিলো- কেউ চুরি করলে তাকে ১ মাস, ২ মাস জেলবন্দী করে রাখো অথবা জরিমানা নিয়ে ছেড়ে দাও। যা বর্তমান বাংলাদেশেও চলছে। তারা আল্লাহর দেয়া বিধানের চেয়ে তাদের তৈরী বিধানকেই উত্তম বলে প্রচার করছে মানুষের মাঝে। অথচ মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর সৃষ্ট জীবের উপর যত বেশি দয়াবান, তত দয়াবান "বাবা-মা তাদের সন্তানদের প্রতিও নয়। যেমন, হাদিসে বর্ণিত আছে- বন্দীদের মধ্য হতে একটি শিশু তার মা হতে পৃথক হয়ে পড়ে। মা তাঁর শিশুর খোঁজে পাগলনীর ন্যায় ছুটাছুটি করে এবং যে শিশুকেই পায়, তাকেই বুকে জড়িয়ে ধরে দুধ পান করিয়ে দেয়। এদৃশ্য দেখে আল্লাহর রসূল (ﷺ) তাঁর সাহাবীগণ (রাঃ)-কে বলেন, আচ্ছা বলতো, অধিকার থাকা সত্ত্বেও কি এ স্ত্রী লোকটি তার শিশুটিকে আগুনে নিক্ষেপ করতে পারে? সাহাবীগণ (রাঃ) উত্তরে বললেন - হে আল্লাহর রসূল (ছাঃ)! কখনই না! আল্লাহর রসূল (ﷺ) তখন বলেন- আল্লাহর শপথ! আল্লাহ্ তা'য়ালা স্বীয় বান্দাদের উপর এর চেয়েও বেশি দয়ালু। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, সূরা নিসার ১১ নং আয়াতের আলোচনার পৃঃ ২৯৯-৩০০)

অতএব, ভেবে দেখুন, এমন দয়াময় আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের জন্য কি এমন কঠিন বিধান প্রণয়ন করতে পারে? যাতে বান্দার কোন কল্যান নেই? কখনোই না, যার প্রমাণ আল্লাহর নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর সময়েই স্পষ্ট হয়েছে। হজরত উমার ইবনে সুমরা (রাঃ) আল্লাহর রছূল (ﷺ) -এর নিকট এসে বলে- হে আল্লাহর রসূল (ﷺ)। আমি চুরি করে ফেলেছি। সুতরাং আপনি আমাকে পবিত্র করে নিন। আমি অমুক কাবীলার উট চুরি করেছি। আল্লাহর রসূল (ﷺ) তখন সেই কাবীলার লোকদের নিকট সংবাদ পাঠিয়ে দেন যে, ওটা সত্য কিনা। তারা বলে, আমাদের একটি উট অবশ্যই চুরি হয়েছে। তখন তাঁর নির্দেশক্রমে হযরত উমার ইবনে সুমরা (রাঃ)-এর হাত কেটে নেয়া হয়। তিনি তখন হাতকে সম্বোধন করে বলেন- “আমি সেই আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যিনি আমার দেহ হতে তোমাকে পৃথক করে দিয়েছেন। তুমি আমার সমস্ত দেহকে জাহান্নামে নিয়ে যেতে চেয়েছিলে।” (তাফসীরে ইবনে কাসীর, সূরা মায়িদার ৩৫ নং আয়াতের আলোচনায়, পৃঃ ৮২৪)

কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি একটু স্থির হয়ে অত্র হাদিসটি ভাবলেই- অনুধাবন করতে পারবে আল্লাহর বিধান মানুষের কল্যাণের জন্য না কি অকল্যাণের জন্য? আমি আবারও বলছি। অবশ্যই অবশ্যই আল্লাহর বিধান সমস্ত বান্দার কল্যাণের জন্যই।

ত্বগুত-ই রব, শুধু চোরের ক্ষেত্রে যে আল্লাহর বিধান বাদ দিয়েছে তা নয়; বরং যিনা, ধর্ষণ ইত্যাদী বিধান বাদ দিয়ে তাদেঁর নিজেদের তৈরী বিধান চালু করে দিয়েছে এবং আল্লাহ্ তা'য়ালা যা অবৈধ করে দিয়েছেন ত্বগুত-ই-রব তা বৈধ করে দিয়েছেন। যেমন মদ, জুয়া, মূর্তিপূজা ইত্যাদি। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। শয়তান তো মদ, জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে ও ছলাতে বাঁধা দিতে চায়। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না? তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর ও রসূলের আনুগত্য কর এবং সতর্ক হও; যদি তোমরা মুখ-ফিরিয়ে নাও তবে জেনে রাখ যে, স্পষ্ট প্রচারই আমার রসূলের কর্তব্য। (সূরা মায়িদা, আ: ৯০-৯২)

অনুরূপভাবে, যিনাও আল্লাহ্ অবৈধ করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, আর যিনা'র নিকটবর্তী হয়ো না, এটা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরন। (সূরা বানী ইসরাইল, আঃ ৩২) আর ত্বগুত-ই-রব , যিনাকে বিভিন্ন কৌশলে বৈধ করেছে। যেমন তারা বলে, প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়েরা মেলামেশা করলে সমস্যা নেই, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন মেয়ে কোন ছেলের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ না উঠাবে। আর সেই ধারাতেই বাংলাদেশে বর্তমানেও নতুন নতুন ধর্ষণ মামলা হচ্ছে। যেমন, নারী-পুরুষ তিন মাস, পাঁচ মাস বা আরো বেশি অবৈধ যৌন মিলন করে ঐ সকল নির্লজ্জ নারীরা গর্ভবতী হচ্ছে। পরবর্তীতে, নারী-পুরুষের নিজেদের দ্বন্দ্বের ফলের নারীরা থানায় ধর্ষণ মামলা করছে, আর তো প্রশাসন ধর্ষণ মামলা হিসেবেই গ্রহণ করছে বাদী নারীকে গ্রেফতার না করে, আসামী পুরুষকে গ্রেফতার করছে।

আবার, ত্বগুত-ই-রব বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কৌশলে পতিতালয়ের বৈধতা দিচ্ছে, পতিতা পল্লির বৈধতা দিচ্ছে ইত্যাদি। যা আল্লাহ্ তা'য়ালার ঘোষণাকৃত হারামকে ''ত্বগুত-ই রব্ব'' হালাল করে দিয়েছে। আর ত্বগুত-ই রব্ব, সে শুধু ইসলাম বিরোধী শাসকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তা নয়; বরং আলেম-পীররাও তার অন্তর্ভুক্ত। যেমন, মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, 'তারা আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের পণ্ডিতগণ (তথা আলেমগণকে) ও সংসার বিরাগীগণ (তথা পীরগণ)-কে তাদের প্রভূরূপে গ্রহণ করেছে। (সূরা তাওবা, আঃ ৩১)

হযরত আদী ইবনে হাতিম (রা:) বলেন, অত্র আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর আমি আল্লাহর রছূল (ﷺ) কে বললাম, হে আল্লাহর রসূল (ﷺ) এটা কিভাবে, তারা তো পণ্ডিতগণকে তথা আলেমগণকে ও সংসার বিরাগীগণকে তথা পীরকে রব্ব হিসেবে গ্রহণ করে না। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, তাদের পণ্ডিতগণ তাদের জন্য যা হারাম করেছে, তারা কি তা হারাম হিসেবে মানে না? অথচ আল্লাহ্ তা'য়ালা তা হারাম করেননি। আর তাদের পণ্ডিতগণ তাদেঁর জন্য যা হালাল করেছে, তারা কি তা হালাল হিসেবে মানে না? অথচ আল্লাহ্ তা হালাল করেন নি। আমি বললাম: হ্যাঁ! হে আল্লাহর রসূল (ﷺ)। অতঃপর তিনি (ﷺ) বললেন, এটাইতো তাদেরকে রব হিসেবে মানা। অতএব, হালাল হারাম ঘোষণা করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর পক্ষ হতে তাঁর রসূলের। আলেমগণ শুধু তার

ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারেন। নিজেদের খেয়াল-খুশি মতো কোন বস্তুকে হালাল বা হারাম বলার অধিকার তাদের নাই। পরবর্তীতে ত্বগুত ই রব্ব, সম্পর্কে আরো আলোচনা করবো ইংশাআল্লাহ্।

۞ তাওহীদ আল-ইবাদাহ (উলূহিয়্যাহ) তথা ইবাদাত বা উপাসনায় আল্লাহ্ একত্ববাদী

মানুষ মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার নাম ও গুণাবলিতে ও মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার একক সৃষ্ট হিসেবে গ্রহণ করতে যতো টা শিরক বা আল্লাহর সাথে অন্য কিছু বা অন্য কারো অংশীদার স্থির না করে তার চেয়ে বেশি পরিমাণ অংশীদার স্থির করে মানুষ মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব তথা এককভাবে বিধান প্রদানের ক্ষেত্রে। আর মানুষ মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার একক ভাবে বিধান প্রদানের ক্ষেত্রে যতোটা অংশীদার স্থির করে থাকে, তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি অংশীদার স্থির করে থাকে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার জন্য এককভাবে ইবাদাতের ক্ষেত্রে।

আর ইবাদাতের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'য়ালার অংশীদার স্থির করাই হলো শিরকে আকবার, বা সবচেয়ে বড় শিরক। কারণ, আল্লাহ্ তা'য়ালাও বিধান প্রদান করেছেন আর ত্বগুতও বিধান চালু করেছে। এতে ত্বগুত নিজেই ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে বা সীমালংঘন করে জাহান্নামের পথে রওনা দিয়েছে, একই সাথে ত্বগুত নিজেও তার অন্তরকে ইলাহ্ বানিয়ে নিয়ে শিরক করেছে।

আর যারা আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধান না মেনে ত্বগুতের তৈরীকৃত বিধান মেনে নেবে, তারা মূলত আল্লাহর গোলামী বা ইবাদাত না করে ত্বগুতেরই গোলামী বা ইবাদাত করে থাকে। ফলে তারা আল্লাহর সাথে অন্য কারো বা কিছুর অংশীদারকারী হিসেবে মুশরিক বলে গণ্য হবে। কেননা, মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা একত্ববাদী। আর তিনি তাঁর অংশীদার স্থির করতে বা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদাত করতে নিষেধ করেছেন। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদাত করো না। (সূরা হা-মীম আস সাজদা, আ: ১৪)
আর ঐ সকল মুশরিক বা অংশীবাদীদের প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, দুর্ভোগ অংশীবাদীদের জন্য। (সূরা হা-মীম আস সাজদাহ, আঃ ০৬)

আর ঐ দুর্ভোগটি কি তাও মহান আল্লাহ তা'য়ালা উল্লেখ করেছেন- মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরী করে তাঁরা এবং মুশরিকরা জাহান্নামের অগ্নিতে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে; তারাই সৃষ্টির নিকৃষ্ট। (সূরা বায়্যিনাহ্, আঃ ০৬) আর এর পিছনেও কারণ হলো, মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা মানুষকে সৃষ্টির কারণ উল্লেখ করে বলেছেন, আমি সৃষ্টি করেছি জ্বিন এবং মানুষকে এজন্য যে, তারা আমারই ইবাদাত করবে (সূরা যারিয়াত, আঃ ৫৬)।

আর মানুষকে তাদেরকে সৃষ্টির কারণ জেনেও মহান পরাক্রমশালী আল্লাহর ইবাদাত না করে আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করে, তারা সেই অংশীদারদের ইবাদাত করে। অথচ, মানুষকে আদেশ করা হয়েছে একমাত্র আল্লাহ্ তা'য়ালারই ইবাদাত করতে। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, তিনিই তো আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই। তিনিই সব কিছুর স্রষ্টা সুতরাং তোমরা তার ইবাদাত কর। তিনিই সব কিছুর তত্ত্বাবধায়ক (সূরা আনআম, আ: ১০২)।

অতএব, আল্লাহ্ ব্যতীত সকল প্রকার ইলাহকে বাদ দিয়ে সকল প্রকার রব তথা আরবাবকে বাদ দিয়ে, সকল প্রকার জিবাতকে বাদ দিয়ে, সকল প্রকার ত্বগুতকে বাদ দিয়ে একমাত্র আল্লাহ্ তা'য়ালারই ইবাদাত করতে হবে একনিষ্ঠভাবে। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, যারা ত্বগুতের ইবাদাত হতে দূরে থাকে এবং আল্লাহর অভিমুখী তাদের জন্য আছে সুসংবাদ। অতএব, সুসংবাদ দাও আমার বান্দাদেরকে (সূরা যুমার, আঃ ১৭)।

আবিদ ও মা'আবুদের মধ্যে সম্পর্কই হলো- ইবাদাত অর্থাৎ আবিদ বান্দা যার ইবাদাত করবে সেই তার মা'আবুদ হিসেবে গণ্য হবে। যেহেতু সকল কিছুর একক ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্ তা'য়ালার এবং তিনিই একমাত্র সত্য মা'আবুদ। সুতরাং, মানুষের জন্য ফরজ বিধান হলো একনিষ্ঠ হয়ে একমাত্র মহান আল্লাহর ইবাদাত বা দাসত্ব করে যাওয়া। আর তাতেই বান্দাদের জন্য রয়েছে সফলতা। তা ব্যতীত কোন সফলতা নেই বরং দুনিয়া ও আখিরাতে আছে তাদের জন্য লাঞ্ছনা। আর মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার জন্য কিছু নির্দিষ্ট দাসত্ব বা গোলামী বান্দার জন্য নির্ধারিত আছে। সেইগুলো অন্য কারো জন্য করা হারাম, কুফরী। যা করলে

বান্দা আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে বা অন্য কিছুকে অংশীদার সাব্যস্তকারী তথা মুশরিক হিসেবে গণ্য হবে। সেই দাসত্ব বা ইবাদাত গুলো আমি নিম্নে ধারাবাহিক ভাবে উল্লেখ করছি-

■ আনুগত্যঃ

মানুষের একনিষ্ঠভাবে অনুগত্য পাওয়ার একমাত্র অধিকার মহান আল্লাহ্ তা'য়ালারই রয়েছে, অন্য কিছুর বা অন্য কারো নেই। কারণ, মহান আল্লাহই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং একমাত্র মহান আল্লাহ্ তা'য়ালাই বান্দাকে পুনরায় জীবন দান করে বিচার ফায়সালা করবেন এবং অপরাধীদের শাস্তি স্বরূপ জাহান্নাম ও পুরস্কার স্বরূপ জান্নাত দান করবেন। সেই ক্ষমতা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো বা অন্য কিছুর নেই। সুতরাং অবিমিশ্র আনুগত্য একমাত্র আল্লাহরই প্রাপ্য। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, জেনে রাখো, অবিমিশ্র আনুগত্য আল্লাহরই প্রাপ্য। (সূরা যুমার, আঃ ০৩)

আর আল্লাহর রছূল (ﷺ) এর আনুগত্য করা ও মহান আল্লাহর আনুগত্যেরই অন্তর্ভুক্ত। কারণ, মহান আল্লাহ্ তা'য়ালাই আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর আনুগত্য করার আদেশ দিয়েছেন। যেমন মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর অনুগত্য ও কর, আনুগত্য কর রসূলের এবং উলীল আমরের (সূরা নিসা, আ: ৫৯)। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদিসে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন- আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহর আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি আমার নিয়োগকৃত আমীরের আনুগত্য করলো, সে আমারই আনুগত্য করলো। যে ব্যক্তি আমার আমীরের অবাধ্যতা করলো, সে আমারই অবাধ্যতা করলো (ছহীহ মুসলিম, হা: ৪৫৯৯)। আর তাছাড়া মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা তার বান্দা বা গোলাম হিসেবে নাবী-রসূলদেরকেও আল্লাহর আনুগত্য করার আদেশ দিয়েছেন মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন- বল, আমি আদেশ প্রাপ্ত হয়েছি আল্লাহর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর ইবাদাত করতে (সূরা যুমার, আঃ ১১)। অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন- বল, আমি ইবাদাত করি আল্লাহরই তার প্রতি আমার আনুগত্য কে একনিষ্ঠ রেখে। (সূরাহ্ যুমার, আঃ ১৪)

অতএব, একনিষ্ঠভাবে একমাত্র আল্লাহ্ তা'য়ালারই আনুগত্য করতে হবে। যেই আনুগত্য আল্লাহর জন্য করা বাধ্যতামূলক, সেই আনুগত্য অন্যের জন্য করা শিরক।

■ ভয়ঃ

ভয় মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার ইবাদাত সমূহের একটি ইবাদত। সেই ভয় আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর উপর বা অন্য কারো উপর করা শিরক। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন - বল, হে আমার মুমিন বান্দাগণ! তোমরা তোমাদের রব্ব-কে ভয় কর। যারা এই দুনিয়াতে কল্যাণকর কাজ করে তাদের জন্য আছে কল্যাণ। (সুরা যুমার, আঃ ১০)

■ ভালোবাসাঃ

বান্দার সর্বোচ্চ ভালোবাসা পাওয়ার একমাত্র হকদার মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা। আর পরস্পরের জন্য যতো ভালোবাসা বা সম্পর্ক হবে- তা আল্লাহর জন্যই এবং পরস্পরের জন্য যতো ঘৃণা বা বিচ্ছেদ হবে তাও একমাত্র আল্লাহ্ তা'য়ালার জন্য।

আর এই জাতীয় ভালোবাসা বা সর্বোচ্চ ভালোবাসা- আল্লাহর জন্য ব্যতীত অন্য কিছুর জন্য অন্তরে রাখা শিরক। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন- আর মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্ ছাড়া অপরকে আল্লাহর সমকক্ষ রূপে গ্রহণ করে এবং আল্লাহকে ভালোবাসার মতো তাদেরকে ভালোবাসে। কিন্তু যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসায় তারা সুদৃঢ়। যালিমরা শাস্তি দেখলে যেমন বুঝবে, হায়! এখন যদি তারা তেমন বুঝত যে, সমস্ত শক্তি আল্লাহরই এবং আল্লাহ্ শাস্তিদানে অত্যন্ত কঠোর। (সূরা বাকারাহ, আঃ ১৬৫)

■ আহবান করাঃ

মানুষের বিপদ মুহূর্তে আহবান করার জন্য আহবান পাওয়ার যোগ্য একমাত্র মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন- তোমাদের রব বলেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিবো। যারা অহংকার বশে

আমার ইবাদতে বিমুখ তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে। (সূরা মু'মিন, আঃ ৬০)

অন্য এক আয়াতে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন- সুতরাং আল্লাহকে ডাক তার আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে, যদিও কাফেররা এটা অপছন্দ করে। (সূরা মু'মিন, আ: ১৪)

অথচ মানুষের মধ্যে যারা অকৃতজ্ঞ তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে বা অন্য কিছুকে আহ্বান করে বা ডাকে অথচ তা শিরক। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, বল, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদেরকে ডাকো, তাদের ইবাদাত করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। বল, আমি তোমাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করি না, করলে আমি বিপথগামী হবো এবং সৎপথ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকবো না। (সূরা আন-আম, আঃ ৫৬)

অন্য এক আয়াতে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা যাকে ডাকো তারা তো তোমাদের সাহায্যে করতে পারে না এবং তাদের নিজেদেরও না। (সূরা আরাফ, আঃ ১৯৭)

■ কুরবানি উৎসর্গঃ

মানুষের যতো ত্যাগ, কুরবানি, উৎসর্গ সকল কিছূই একমাত্র আল্লাহর জন্যই হতে হবে। যদি কোন ব্যক্তি নিজেকে উৎসর্গ করতে চায় তবে তা একমাত্র আল্লাহর জন্যই করতে হবে। অন্য কারো জন্য বা অন্য কিছুর জন্য করা যাবে না। আর মানুষ যা কিছু করবে এক মাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই করতে হবে। অন্য কারো সন্তুষ্টির আশায় করা শিরক আর মানুষ যেই হালাল পশু কুরবানি করাবে তাও একমাত্র আল্লাহর জন্যই আল্লাহর নামেই হতে হবে। অন্য কারো জন্য বা অন্য কিছুর জন্য কুরবানি করা শিরক। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন- বল, আমার ছলাত, আমার কুরবানি ও হজ্জ, আমার জীবন ও আমার মরণ, জগৎসমূহের রব্ব আল্লাহর উদ্দেশ্যে। (সূরা আনআম, আঃ ১৬২)

■ সালিশ বা বিচারক:

আল্লাহ্ ব্যতীত একমাত্র বা সর্বোচ্চ বিচারক বা সালিশ অন্য কাউকে মানা শিরক। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন- বল, তবে কি আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে সালিশ

মানবো। যদিও তিনিই তোমাদের উপর সুস্পষ্ট কিতাব অবতীর্ণ করেছেন? (সূরা আনআম, আ: ১১৪)

অন্য এক আয়াতে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন- তুমি কি তাদেরকে দেখ নাই যারা দাবি করে যে, তোমার প্রতি যা নাযিল হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা নাযিল হয়েছে তাতে তারা বিশ্বাস করে। অথচ তাঁরা ত্বগুতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়। যদিও তা প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে আদেশ দেয়া হয়েছে এবং শয়তান তাদেরকে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়। (সূরাহ্ নিসা, আঃ ৬০)

■ সাজদাঃ

সাজদা অর্থ হলো আল্লাহর উদ্দেশ্যে নতজানু হওয়া। এটা আল্লাহর তা'য়ালার ইবাদাত সমূহের মধ্যে অন্যতম একটি ইবাদত যা অন্য কারো উদ্দেশ্যে করা শিরক। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন- আর এই যে, মাসজিদ সমূহ আল্লাহর জন্য। সুতরাং আল্লাহর সহিত তোমরা অন্য কাউকে ডেকো না। (সূরা জ্বিন, আঃ ১৮) অত্র আয়াতে মাসজিদ সমূহ বলতে সাজদার স্থান-সমূহ কে বুঝানো হয়েছে। ইবনে কাসীর (রহিঃ) বলেন, الْمَسَاجِد অর্থে এইখানে সেই সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যা সিজদার সময় ভূমি স্পর্শ করে। (তাফসীরে ইবনে কাসীর- সূরা জ্বিন এর ১৮ নং আয়াতের আলোচনায়) আর আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন- আমি সাত অঙ্গে সিজদাহ্ করতে এবং চুল ও পরিধেয় বস্ত্র না গুটাতে আদিষ্ট হয়েছি। ইবনু তাঊস (রহঃ) বলেন, আমার পিতা বলতেন, (সাত অংগ হল) দু হাত, দু হাঁটু, দু পা এবং কপাল ও নাক। তিনি নাক ও কপালকে একটি অঙ্গ গণ্য করতেন। (বুখারী ৮০৯-১০, ৮১২, ৮১৫-১৬; মুসলিম ৪৯০/১-৫, তিরমিযী ২৭৩, নাসায়ী ১০৯৩, ১০৯৬-৯৮, ১১১৩, ১১১৫; আবূ দাঊদ ৮৮৯-৯০, আহমাদ ২৫২৩, ২৫৭৯, ২৫৮৩, ২৬৫৩, ২৭৭৩, ২৯৭৬; দারিমী ১৩১৮-১৯, মাজাহ ৮৮৩, ৮৮৪, ১০৪০)

অতএব, পীর-ফকীর, গাছ-পাথর, কবর, মূর্তি ইত্যাদির নিকট সিজদা করা বা মাথা নত করে দুই হাতের কর একত্রিত করে বিনয় জানানো শিরক।

■ সাহায্য প্রার্থনা করাঃ

বান্দার কোন কিছু প্রয়োজন হলে, যা বান্দা দিতে পারে না এবং তা একমাত্র আল্লাহরই এখতিয়ারভুক্ত। তা শুধুমাত্র আল্লাহর নিকটেই সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে। অন্য কারও নিকট বা অন্য কোন কিছুর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা শিরক।

যেমন- বিপদে পড়লে, চাকরির মাধ্যমে রিযিকের জন্য, সন্তানের জন্য বা পুত্র সন্তানের জন্য, সুস্থতার জন্য মানুষ পীর-ফকির, মূর্তি, কবর, গাছ-পাথরের সাহায্য প্রার্থনা করে বা তাদের শরণাপন্ন হয়।

মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন- যারা নিজেদের নিকট কোন দলীল না থাকলেও আল্লাহর নিদর্শন সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়, তাদের অন্তরে আছে কেবল অহংকার যারা এই ব্যাপারে সফলকাম হবেনা। অতএব, আল্লাহর শরণাপন্ন হও ; তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (সূরা মু'মিন, আঃ ৫৬)

অন্য এক আয়াতে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বান্দাদের শিক্ষা দিয়ে বলেন- (তোমরা বলো) আমরা শুধু তোমারই ইবাদাত করি, শুধু তোমারই সাহায্যে প্রার্থনা করি। (সূরা ফাতিহা, আঃ ০৪)

আর সন্তান দান করার মালিক একমাত্র আল্লাহ্ তা'য়ালা। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন- আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর আধিপত্য আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। অথবা দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা তাকে দান করে দেন বন্ধ্যা; তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। (সূরা শূরা, আঃ ৪৯-৫০)

■ যিকির বা স্মরণঃ

যিকির আল্লাহ্ তা'য়ালার ইবাদাত সমূহের একটি অন্যতম ইবাদাত। যা অন্য কিছুর জন্য বা অন্য কারো জন্য করা শিরক। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, তোমার রব্বকে মনে মনে সবিনয় ও নিঃসংকচিত্তে অনুচ্চস্বরে সকাল ও সন্ধ্যায় যিকির করবে এবং তুমি উদাসীন হবে না (সূরা আ'রফ, আঃ ২০৫)। অন্য এক আয়াতে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন- সুতরাং তোমরা আমাকেই স্মরণ কর, আমিও তোমাদের ডাকে সাড়া দিবো (সূরা বাকারাহ, আঃ ১৫২)। অতএব, আল্লাহর নাম জপা বা আল্লাহর নামে যিকির করা ব্যতীত অন্য কিছুর নামে যিকির করা যাবে না। এমন কি আল্লাহর রসূল (ﷺ) এর নামেও যিকির করা যাবে না। অনেকেই নাশিদের সূরে বলে থাকেন- নবী নাম জপে যে জন, সে তো দো জাহানের ধনী, এটা বলাও শিরকের অন্তর্ভুক্ত। নবী নাম জাপা ও নবী নামের যিকির করা একই

বিষয়। অতএব, নবী নামের যিকির করা যাবে না, তবে নাবী (ﷺ) এর জন্য দরুদ তথা ছলাত ও ছালাম পাঠানো যাবে। বরং তা ওয়াজিব।

উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলো আল্লাহ্ তা'য়ালার নির্ধারিত বান্দার জন্য নির্দিষ্ট ইবাদাত। যা অন্য কারো জন্য করা হারাম ও শিরক। আল্লাহ্ ব্যতীত যাদের জন্য সেইগুলো করা হবে তারা সকলেই ত্বগুত হিসেবে গণ্য হবে।

ত্বগুতের বিভিন্ন প্রকার

ত্বগুতের প্রকার সম্পর্কে নিম্নে আমি সংক্ষেপে উল্লেখ করলাম-

◘ [১] ইবলিস:
মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন: হে বানী আদম; আমি কি তোমাদেরকে আদেশ দেই নাই যে, তোমরা শয়তানের দাসত্ব করো না, কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? (সূরা ইয়াসীন, আঃ ৬০)

◘ [২] ইসলাম বিদ্বেষী শাসক:
মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, তুমি কি তাদেরকে দেখ নাই? যারা দাবি করে যে, তোমার প্রতি যা নাযিল হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা নাযিল হয়েছে তাতে তারা বিশ্বাস করে; অথচ তারা ত্বগুতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়। যদিও তা প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং শয়তান তাদেরকে ভীষনভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়। (সূরা নিসা, আঃ ৬০)

◘ [৩] আল্লাহর আইন দ্বারা যারা বিচার করে না, সেই সকল বিচারক:
আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা দিয়ে যারা বিচার-ফয়সালা করে না তারাই কাফের। (সূরা মায়িদাহ্, আ: ৪৪)
অত্র আয়াতের আলোচনায় হযরত সুদ্দী (রহিঃ) বলেন, যদি ইচ্ছাপূর্বক আল্লাহর ওয়াহীর বিপরীত রায় দেয়, জানা সত্ত্বেও তার উল্টো করে তবে সে কাফের। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, সূরা মায়িদার ৪৪ নং আয়াতের আলোচনায়, পৃঃ ৮৩৬)

■ [৪] জ্ঞানপাপী আলেম ও পীর ফকির:
আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন- তারা আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের পণ্ডিতগণকে ও সংসার-বিরাগীগণকে তাদের প্রভূ রূপে গ্রহণ করেছে। (সূরা তাওবা, আ: ৩১)

■ [৫] যাদুকর:
মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন- এবং সুলাঈমানের রাজত্বে শয়তানরা যা আবৃত্তি করতো, তা তারা অনুসরণ করতো। সুলাঈমান কুফরী করে নাই, কিন্তু শয়তানরাই কুফরী করেছিলো। (সূরা বাকারাহ্, আ: ১০২)

■ [৬] 'তাকলিদুল আবা' বা বাপ-দাদার অনুসারী:
আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন- যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা তোমরা অনুসরণ কর; তারা বলে, না বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের যাতে পেয়েছি তার অনুসরণ করব। এমনকি, তাদের পিতৃপুরুষগণ যদিও কিছুই বুঝতো না এবং তারা সৎ পথেও পরিচালিত ছিল না তথাপিও? (সূরা বাকারাহ্, আঃ ১৭০)

■ [৭] আল্লাহ্ প্রদত্ত দ্বীন ইসলাম ব্যতীত অন্য দ্বীন প্রতিষ্ঠাতা ও প্রবর্তকগণ:
মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন- নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট একমাত্র দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা ইসলাম। (সূরা আলে-ইমরান, আঃ ১৯)
অর্থাৎ, যারা ইসলাম ব্যতীত অন্য দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করেছে বা দ্বীনের প্রবর্তক। যেমন- গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র, বৌদ্ধ, ইয়াহুদীবাদ, খ্রিষ্টবাদ, হিন্দুত্ববাদ ইত্যাদি। তারা সকলেই ত্বগুত।

■ [৮] হাওয়া বা খেয়াল খুশির অনুসরণ:
আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন- তুমি কি দেখনা তাকে, যে তার কামনা-বাসনাকে ইলাহ্ রুপে গ্রহণ করে? (সূরা ফুরকান, আঃ ৪৩)

■ [৯] ইলমে গায়েবের দাবীদার:
মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন- গায়েবের কুঞ্জি তাঁরই নিকট রয়েছে, তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তা জানে না (সূরা আন-আম, আঃ ৫৯)। (ইসলামের বুনিয়াদ শিক্ষা পৃ: ১০-১৫)

অতএব, যে সকল পীর-ফকির, গণক-জোতিষ দাবী করে যে, তারা গায়েব জানে তারা সকলেই ত্বগুত। তবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন তাকে জানান। অনেকে বলে থাকে জোতিষ-গনক গায়েবের খবর বলতে পারে। কারণ তারা যা বলে তার অনেক কথাই সত্য হিসেবে পাওয়া যায়।

এ প্রসঙ্গে আম্মাজান আয়িশাহ্ (রাঃ) বলেন, লোকেরা নাবী (ﷺ)-কে জোতিষদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন, তারা কিছুই নয়। তারা জিজ্ঞেস করল- হে আল্লাহর রসূল (ﷺ)! কখনো কখনো তারা তো এমন কিছুও বলে, যা সত্য হয়। এতে নাবী (ﷺ) বললেন, এগুলো সত্য কথার অন্তর্ভুক্ত। জ্বিনেরা এসব ছোঁ মেরে শোনে, পরে তাদেঁর বন্ধুদের কানে মুরগির মতো কর কর করে নিক্ষেপ করে দেয়। এরপর, এসব জোতিষীরা এতে শত মিথ্যা মিশিয়ে দেয়। (ছহিহ বুখারী, হা: ৭৫৬১)

মূলত জ্বিনেরা আসমান থেকে কিছুই শুনতে পায় না; বরং দুনিয়াতেই যেই কথাটি উল্লেখ হয়েছে, সেই কথাই তারা ছোঁ মেরে শোনে। কারণ আল্লাহর রসূল (ﷺ) -এর নাবুয়াত প্রাপ্তির পর থেকে জ্বিনদের প্রথম আসমান পর্যন্ত যাওয়া এবং আসমান থেকে কোন কথা শ্রবণ করা বন্ধ হয়ে গেছে।

এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজিদের বেশ কয়েকটি আয়াত উল্লেখ রয়েছে। যার প্রমাণ নিম্নে উল্লেখ করলাম-

দলীল-১: মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, "এবং আমরা চেয়েছিলাম আকাশের তথ্য সংগ্রহ করতে কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিন্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ। আর পূর্বে আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শুনার জন্য বসতাম কিন্তু এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে সে তার উপর নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত জ্বলন্ত উল্কাপিন্ডের সম্মুখীন হয়।" (সূরা জ্বিন, আঃ ৮-৯)

দলীল-২: মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, আমি আকাশে গ্রহ-নক্ষত্র সৃষ্টি করেছি এবং তাকে সুশোভিত করেছি দর্শকদের জন্য এবং প্রত্যেক অভিশপ্ত শয়তান হতে আমি তাকে রক্ষা করে থাকি। কিন্তু কেউ চুরি করে সংবাদ শুনতে চাইলে তার পিছনে তাড়া করে প্রদীপ্ত শিখা। (সূরা হিজর, আঃ ১৬-১৮)

দলীল-৩: হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, ফেরেশতারা 'ইনান' অর্থাৎ মেঘমালা পর্যন্ত অবতরণ করে। যেখানে আল্লাহ্ তা'য়ালার জারিকৃত সিদ্ধান্তসমূহ পরস্পরে আলোচনা করে। শয়তানরা এখান থেকে এগুলো ছোঁ মেরে চুরি করে তাদের বন্ধুদের কাছে পৌঁছেয়ে দেয় এবং তাতে নিজেদের পক্ষ থেকে শত শত মিথ্যা বিষয় সংযোজন করে দেয়। -(মাযহারী) [মারেফুল কুরআন-১৪১০ পৃ.]

এক নং দলীলে উল্লেখিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'য়ালা মুমিন জ্বিনদের সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন, "মুমিন জ্বিন'রা আকাশের সংবাদ নিতে পারে না, পূর্বে পারতো।" আর দুই নং দলীলে উল্লেখিত হয়েছে যে, "অভিশপ্ত শয়তান জ্বিনও আকাশের খবর নিতে পারে না। তাহলে আর কোন জ্বিন আকাশের সংবাদ বা কথা ছোঁ মেরে নিয়ে প্রচার করবে?"

"আল্লাহর নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর নাবুওয়াত প্রাপ্তির পর এখনো জ্বিনেরা আসমানের কথা আনতে পারে" এই বিশ্বাসটি ইসলাম সমর্থন করে না। অতঃপর, জ্বিন মুমিন হোক বা কাফের হোক বা সরাসরি ইবলিস'ই হোক তারাও গায়েব জানে না। মুমিন জ্বিনদের কথা উল্লেখ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

"(আমরা জানিনা) পৃথিবীর মানুষদের কোনো অনিষ্ট সাধনের উদ্দেশ্যেই কি এসব (উল্কাপিন্ড বসিয়ে রাখা) হয়েছে? না (এর মাধ্যমে) তাদের মালিক তাদের সঠিক পথ দেখাতে চান?" (সূরা জ্বিন, আ: ১০)

যখন আমি তার উপর মৃত্যুর আদেশ জারি করলাম, তখন তাদের (জ্বিন ও মনুষ্যকর্মী বাহিনীর) কেউই বাইরের লোকদের তার মৃত্যুর খবর দেখায়নি। (দেখিয়েছে) কেবল একটি (ক্ষুদ্র) ঘুন পোকা, যা (তখনো) তার লাঠিটি খেয়ে যাচ্ছিলো (সুলাঈমান (আঃ) এর লাঠি পোকায় খাওয়ায়) যখন সে (মাটিতে) পড়ে গেলো, তখন জ্বিনেরা বুঝতে পারলো (সুলাঈমান জীবিত নাই)। (তারা যদি গায়েবের বিষয় জানতো তাহলে তাদের (এতো সময়) লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তিতে থাকতে হতো না। অতঃপর, উল্লেখিত ত্বগূত থেকে অবশ্যই আমাদেরকে দূরে থাকতে হবে এবং ত্বগুতকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে ও তা সমূলে ধ্বংসের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা থাকতে হবে। কেননা, মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, যে ত্বগুতকে

অস্বীকার করবে ও আল্লাহে ঈমান আনবে, সে এমন এক মজবুত হাতল ধরবে যা কখনো ভাঙ্গবে না। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, প্রজ্ঞাময়। (সূরা বাকারাহ্, আঃ ২৫৬)

আর এই একই কাজ মহান আল্লাহ তা'য়ালা প্রত্যেক নাবী রসূলকে দিয়ে পাঠিয়ে ছিলেন। এই কাজটি নাবীওয়ালা কাজের প্রধান ও অন্যতম। এই লক্ষ্য উদ্দেশ্যই নাবীওয়ালা কাজ শুরু হয়, এই কাজ ব্যতীত কোন নাবীওয়ালা কাজ নেই। কারণ, নাবী-রসূলদের প্রথম ও প্রধান কাজ ছিলো ত্বগুতের সাথে কুফরী করা আর আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা।
মহান আল্লাহ্ তায়ালা বলেন- আল্লাহর ইবাদাত করার ও ত্বগুতকে বর্জন করার আদেশ দেওয়ার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যে রসূল পাঠিয়েছি। (সূরা নাহল, আঃ ৩৬)

মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা অত্র কিতাব থেকে তাওহীদ সম্পর্কে বুঝে তাওহীদ গ্রহণ করা এবং ত্বগুতকে বর্জন করার তাওফীক দান করুন। আমীন

ত্বগুত সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে হলে আমার লেখা "ত্বগুত ও জীব্ত" বইটি অধ্যায়ন করুন।

(সুবহা-নাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লা আংতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইকা)

হাবীবুল্লাহ মাহমুদ এর লিখিত বইসমূহঃ

১। সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ

২। আপনার যাকাতে যাদের হক রয়েছে

৩। মাসজিদে যিরার (লিখিত বক্তব্য)

৪। ইসলামের বুনিয়াদ শিক্ষা

৫। ইসলাম পালনের মূলনীতি

৬। মুক্তির পয়গাম

৭। ইসলামে সামাজিক জীবন

৮। তোমার লক্ষ্য যেন হয় জান্নাত

৯। দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে নারীদের ভূমিকা

১০। ইসলামে মৃত ব্যক্তিদের সম্পদ বণ্টন নীতি

১১। তাওহীদ আল ইবাদাহ